দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

আই.এন.ডি.আই.এ. জোটের দলগুলি অভ্যাসে হিন্দুবিরোধী — পৃঃ ২৩

ধর্মনিরপেক্ষতার কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ঘোরী তৈমুর চেঙ্গিজের বংশজরা — পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।। ২ অক্টোবর, ২০২৩।। ১৪ আশ্বিন - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

হিন্দুত্বের ওপর আক্রমণ

আসল উদ্দেশ্য কি ?

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১৪ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২ অক্টোবর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

‘হুকুম তোমার ফলবে কবে’ মমতা কি নিজেই নিজের বিনাশের নিদান হাঁকছেন ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

এত টাকা দিয়ে কী হবে! ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

চীনের বি আর আই প্রকল্প ভারতীয় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ☐ **সোমনাথ মুখার্জী** ☐ ৮

আমেরিকা-রাশিয়ায় ভারতের যৌথ সেনা-মহড়া ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

ধর্মনিরপেক্ষতার কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ঘোরী তৈমুর চেঙ্গিজের বংশজরা ☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠি ☐ ১১

পরিকল্পিত নুহ হিংসার পিছনে ছিল সাইবার ক্রাইম ☐ সুদীপনারায় ঘোষ ☐ ১৩

দেশকে ভারত নামেই ডাকতে হবে ☐ তরুণ কুমার পণ্ডিত ☐ ১৫

ক্রেতা সুরক্ষা রক্ষায় আদালতগুলি আগের তুলনায় অধিক সক্রিয় হয়ে উঠছে ☐ শেখর সেনগুপ্ত ☐ ১৬

আই.এন.ডি.আই.এ জোটের দলগুলি অভ্যাসে হিন্দু বিরোধী ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ২৩

হিন্দুরা আর সনাতন ধর্মের অপমান সহ্য করবে না ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ২৬

আই.এন.ডি.আই.এ. জোট দেশের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে অসম্মান করছে ☐ সুব্রত মণ্ডল ☐ ২৭

সনাতন ধর্ম একটি জীবন দর্শন : সুপ্রিম কোর্ট ☐ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ২৯

সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং ভারতবাসীর ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই ☐ কল্যাণ গৌতম ☐ ৩১

শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত সাধু নাগ মহাশয়ের শক্তি সাধনা ☐ নিতাই নাগ ☐ ৩২

বলরাম জয়ন্তী পালনের তাৎপর্য ☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ৩৩

পার্বত্য চট্টগ্রামে জেহাদিদের সক্রিয়তা ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক ☐ ৩৪

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ‘যার মাথায় দিদির হাত সেই খায় জেলের ভাত!’ ☐ বরুণ মণ্ডল ☐ ৩৫

পশ্চিমবঙ্গ দিবস ও ‘স্বাধীন সার্বভৌম, অখণ্ড বাংলা’ সম্পর্কে কেন এই অনৃত ভাষণ ☐ বিনয়ভূষণ দাশ ☐ ৩৮

ঐক্যের প্রতিমূর্তি ও অপারেশন পোলো ☐ দুর্গাপদ ঘোষ ☐ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ☐ অন্যরকম : ৩৭ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ ☐ স্মরণ : ৪৯

ফঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৯ অক্টোবর, ২০২৩

আগামী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা। থাকবে বিভিন্ন স্বাদের উপন্যাস, বড় গল্প, ছোট গল্প, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ।

দাম সত্তর টাকা মাত্র।।

আগামী ১৬ অক্টোবরের সংখ্যায় থাকছেপশ্চিমবঙ্গের বনেদী দুর্গাপুজো নিয়ে কয়েকটি বিশেষ বিবরণ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিরোধীদের হিন্দু বিদ্বেষ

'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'— এই প্রবাদ বাক্য গ্রাম্য কথা হইলেও ভারতবর্ষের রাজনীতির আসরে ইহার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাইতেছে। রাজনীতির সহিত ধর্মের বিদ্বেষ হইবার কথা নহে। কিন্তু ক্ষমতার লোভ সামলাইতে না পারিয়া নিজের বাপ-ঠাকুরদাদাকেও অপমান করিতে কুণ্ঠা বোধ হইতেছে না। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলের বেশির ভাগ নেতা জন্মসূত্রে হিন্দু। ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ হিন্দুত্ব আধারিত হইলেও বাকিদের আদর্শ পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ আধারিত। বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করিবার লক্ষ্যে সমগ্র হিন্দু সমাজকে তথা হাজার বছরের সনাতন ভাবধারাকে অপমান করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেছে না। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন পুত্র উদয়ানিধি সনাতন ধর্মকে শুধু অস্বীকার করে নাই; ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, করোনার মতো কিছু মহামারী রোগের সহিত তুলনা করিয়া সমাজ হইতে উৎখাত করিবার সংকল্প করিয়াছে। একজন রাজনৈতিক নেতা প্রকাশ্যে জনসমক্ষে যেভাবে দেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের ভাবাবেগকে আঘাত করিয়াছে তাহা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। এইরূপ বিষোদ্গার বা হুঙ্কার সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষ এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট করিবে।

সনাতন ধর্ম হইল শাশ্বত ও চিরন্তন, ভারতের আত্মা। ইহা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের প্রতীক। ইহা কোন উপাসনা বা পূজা পদ্ধতি নয়, বরং একটি চলমান জীবন দর্শন। সনাতন ধর্ম অপরকে সম্মান করিতে শেখায়। মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে, সকলের কল্যাণ কামনা করে। এই পাঠ রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা জানেন না তাহা নহে, কিন্তু ভোটের স্বার্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা কেবলমাত্র নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করিবার জন্য উদয়ানিধির বিপক্ষে কিছু বলিবার সাহস দেখাইতেছে না। ইহা অত্যন্ত অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক। রাজনৈতিক নেতারা দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করিবার সাহস পাইয়া থাকেন কারণ হিন্দুসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ নয়, বিশেষ করিয়া ভোট দানের ক্ষেত্রে। সনাতনী বা হিন্দুরা সংগঠিত হইলে এইরূপ অপমানজনক কথা বলিবার সাহস কেহ করিত না। হিন্দু ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে, এক পৃথিবী এক পরিবারের ভাবনা লইয়া চলে। প্রকৃত ঘটনা হইল যে বিদেশি মদতপুষ্ট কিছু বিঘটনকারী শক্তি নিরন্তর প্রয়াস করিয়া চলিতেছে হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করিবার। কারণ হিন্দুসমাজ সংগঠিত হইলে দেশ শক্তিশালী হইবে। ইহার পশ্চাতে বিদেশি শক্তির আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে মদত রহিয়াছে যাহা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং দেশবিরোধী শক্তির ফাঁদে পা না দিয়া হিন্দুসমাজকে ভেদাভেদ ভুলিয়া সনাতন ঐতিহ্যের ছত্রছায়ায় সংগঠিত হইতে হইবে। ইতিমধ্যে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া নরেন্দ্র মোদীকে পরাজিত করিতে বিদেশি শিল্পপতি অর্থ ও শক্তি দিয়া হিন্দুশক্তিকে বিভাজন করিবার খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে। সেই পরিবেশে বিরোধী আই.এন.ডি.আই.এ. জোট ক্ষমতা দখলের নিমিত্ত মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

সুখের কথা এইসব আদর্শবিহীন বিভিন্ন ক্ষমতালোভী নেতাদের জোট, যাহাদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি নাই, তাহাদের এই ছন্নছাড়া অভিযান যে সফল হইবে না তাহা সাম্প্রতিক কয়েকটি জনমত সমীক্ষায় স্পষ্ট হইয়াছে। দেশের মানুষ অনেক বিচক্ষণ, তাঁহারা ক্ষমতালোভী, পরস্পরবিরোধী, দুর্নীতিগ্রস্ত দলগুলির হাতে শাসনক্ষমতা তুলিয়া দিবার মতো ভুল করিবেন না। সুতরাং আগামী দিনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে মোদীজীর নেতৃত্বে বলিষ্ঠ, পরিচ্ছন্ন সরকারের সঙ্গে দিশাহীন, দুর্নীতিবাজ দলগুলির জোটের। অতএব আই.এন.ডি.আই.এ. জোটের নেতারা সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার না করিয়া নিজেদের সংস্কারিত করিলে দেশের মঙ্গল হইবে।

সুভাষিতম্

অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যাঘ্রং নৈব চ নৈব চ।
অজাপুত্রো বলিং দদ্যাৎ দেবো দুর্বলঘাতকঃ।।

যজ্ঞের বলি দেওয়ার জন্য অশ্ব নয়, হাতি নয়, বাঘের তো প্রশ্নই নেই। অজাপুত্র মানে ছাগলকে বলি দেওয়া হয়। দেবতারাও দুর্বলের ঘাতক হন।

‘হুকুম তোমার ফলবে কবে’
মমতা কি নিজেই নিজের বিনাশের নিদান হাঁকছেন

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ন্যায়ের পথ বহুমুখী। ভিন্ন বিচারে ভিন্ন ভাষা আর অর্থ। সে ফাঁক দিয়েই গলে যায় দুর্বৃত্ত, দুরাচারী আর দুঃশাসনরা। হাকিম আর হুকুম আলাদা হয়ে যায়। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলে যে দুর্নীতির পোকা লেগেছে সেটা সবাই জানেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই প্রথম ইসিআইআর বা সোজা কথায় এফআইআর হয়েছে। এই প্রথম তিনি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হলেন। অনেক দিন থেকে রাজ্যের মানুষ নির্দিষ্ট ভাবে তদন্তকারী সংস্থাদের কর্মতৎপরতা দেখতে চাইছেন। আমার ধারণা সেই দিন খুব দূরে নেই। চতুর মমতা তা জানিয়ে রেখেছেন। লিখেছিলাম সেপ্টেম্বর ডেডলাইন।

তাই হলো। আইনের চোখে অভিষেক অভিযুক্ত হলেন। সব বুঝে অনেকটা তাই ইচ্ছে করেই নজর ঘোরাচ্ছেন মমতা। সঙ্গে জুটেছে মধ্যস্থতাকারী কিছু সাংবাদিক। লগ্নি নিবেশ করাতে মমতা এদের নিয়ে স্পেনে গিয়েছিলেন। এই ধরনের সফরকে ‘জাংকেট’ বলে। ‘জাংক’ বা উচ্ছিষ্ট থেকে তার উৎপত্তি। ২০১৩ থেকে মমতা রাজ্যে ব্যবসা টানার চেষ্টা চালাচ্ছেন। রাজ্যপাট আগেই তাকে সার্কাস আর কুমির ছানার খেলা বলেছে। মমতার শিল্প রাজ্য শিল্প শ্মশান হয়ে গিয়েছে। মমতার দাবি ন'বছরে ১১ লক্ষ কোটি টাকার শিল্প সম্ভাবনা রাজ্যে তৈরি হয়েছে। দাবিটা হাস্যকর। শাসকের দুর্নীতি, তার অনৃত ভাষণ সহ বহু অন্যায়ের সমাহারের বিরুদ্ধে এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

মমতার দলের পরামর্শদাতা সংস্থা আগেই জানিয়ে রেখেছে বিজেপি এ রাজ্যে থাকতে এসেছে। চলে যেতে নয়। এই সত্য মমতা যেমন জানেন তেমন মানেন। তবে প্রকাশ করেন না। তাই ইন্ডি জোটে সিপিএম আর কংগ্রেসের পাশে বসে পড়েছেন। তার বড়ো প্রমাণ ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে বিজেপি-র ভোট কেটে মমতাকে জিতিয়েছে সিপিএম। মমতাকে ভোট কাটুয়া বলেছিলেন রাহুল গান্ধী। আর সিপিএম-কে ভোট কাটুয়া বলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ইন্ডি মঞ্চে ভোট কাটুয়া সিপিএম আর তৃণমূলের উপস্থিতি ‘হাঁসজারু’ সমন্বয়। সিপিএম সমন্বয় কমিটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। মমতার উপায় নেই। তদন্তের ফাঁস তাঁর গলায় ক্রমশ চেপে বসছে। তাই বিজেপি বিরোধী মঞ্চে তাকে থাকতেই হবে। তাতে লাভ হবে বলে মনে হয় না।

আদালতের তৎপরতায় এই তদন্তের কাজ চলছে। সকলের জানা জাতীয় রাজনীতিতে বামেরা অনেকদিন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন। তাহলে মমতার সঙ্গে তাদের সখ্যতা কীসে? কেনই বা তারা একজোটে? এটা লক্ষ্যণীয় মমতা সিপিএম বা কংগ্রেসকে আক্রমণ করছেন না কেন? মমতার বড়ো দুর্বলতা এ রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোট। তবে সে ভোটের কিছু অংশ দেশ বিরোধী হলে মমতা কি করবেন তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। রাজ্য বিধানসভার ১২৮টি সংখ্যালঘু আসন মমতার পাখির চোখ। সিপিএম বা কংগ্রেসকে কাছে নিয়ে মমতা ওই সংখ্যালঘু ভোটকেই নিজের কাছে রাখতে চায়। তাই রাজ্য থেকে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া বামপন্থী আর কংগ্রেসকে কাছে পেতে এতটাই আগ্রহী মমতা। আপাতত তদন্তকারীদের হাত থেকে পরিবারকে বাঁচাতেই উদ্যোগী মমতা। পরাজয় অনেককেই পরাভূত করে যদি না কেউ তার ব্যতিক্রম হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে জাতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস আর বাম সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন।

জাতীয়স্তরে কংগ্রেস ভেঙে জি-২৩ তৈরি হয়েছে। সদস্য সংখ্যার অভাবে এখানে বামেদের শাখা আর লোকাল কমিটিতে তালা পড়েছে। তৈরি হয়েছে এরিয়া কমিটি। ফলে বিজেপি যে রাজ্যের ভবিতব্য তা অনেকেই মেনে নিচ্ছেন।

জাতীয়স্তরে কংগ্রেস ভেঙে জি-২৩ তৈরি হয়েছে। সদস্য সংখ্যার অভাবে এখানে বামেদের শাখা আর লোকাল কমিটিতে তালা পড়েছে। তৈরি হয়েছে এরিয়া কমিটি। ফলে বিজেপি যে রাজ্যের ভবিতব্য তা অনেকেই মেনে নিচ্ছেন। সাধারণভাবে মানুষ জয়ীদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে কারণ তারা অশান্তি চান না। তবে মনে হয় জয়ী মমতার আনন্দের দুধে দু'ফোঁটা চোনা পড়ে গিয়েছে। তাই সে ছানা কাটা দুধ বাতিল হতে বাধ্য। সময়টা কবে আর কখন সেটাই প্রশ্ন। □

এত টাকা দিয়ে কী হবে!

খরচচিন্তেষু দিদি,

সম্বোধনটা দেখে অবাক লাগছে তো দিদি! জানি। আসলে আমার মতো ছাপোষা বাঙ্গালির চিন্তা হয় আয় নিয়ে। খরচ আছে, টাকা নেই। কিন্তু নবান্নের যা খবর তাতে তো আপনার উলটো দশা। টাকা রয়েছে। মানে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া টাকা রয়েছে কিন্তু আপনি খরচ করতে পারছেন না। স্পেন আর দুবাই সফর করে এসে নতুন চিন্তা এখন আপনার মাথায়। কী যে পরামর্শ দিই, ভেবেই পাচ্ছি না।

আপনি সব সময়েই বলেন যে, রাজ্যের হাতে টাকা নেই। বড়ো অভাবে চলতে হচ্ছে। ঋণের পরে ঋণ করে চলেছেন। সেটা অবশ্য রাজ্য সরকারের খরচ মেটাতে। বেতন তো রয়েছেই, তার সঙ্গে দান, অনুদান, খয়রাতি মিলিয়ে খরচ কম নাকি! তার উপরে আপনি বারবার বলেন যে, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। সেটা অবশ্য ঠিক নয় বলেই শুনেছি। জিএসটি বাবদ আপনার সরকারের যা প্রাপ্য সবই শুনেছি ঠিক সময়ে মিটিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। তবে হ্যাঁ, কয়েকটি প্রকল্পের টাকায় এতটাই গরমিল যে কেন্দ্র ইচ্ছা থাকলেও টাকা দিতে পারে না। কিন্তু এই খবরটা কি ঠিক দিদি, কেন্দ্রের দেওয়া এত টাকা সরকারের কোষাগারে পড়ে রয়েছে, খরচ করাই যাচ্ছে না!

ক'দিন আগেই একটা সংবাদে দেখলাম বিষয়টা। কেন্দ্র থেকে আসা পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বিপুল পরিমাণ টাকা দীর্ঘদিন ধরেই জমে পড়ে রয়েছে রাজ্যের তহবিলে। গত অর্থবর্ষের জমে থাকা বরাদ্দ এবং নতুন অর্থবর্ষের বরাদ্দ খরচ করাই এখন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনার সরকারের কাছে। এটাও জানলাম যে, সরকার যদি প্রতিদিন ৬০ কেটি টাকা করে খরচ করতে না পারে তবে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যাবে না।

আচ্ছা দিদি, এগুলো তো উন্নয়নের টাকা। কিন্তু আপনি যে বলেন সব উন্নয়ন হয়ে গিয়েছে। আপনি যে বলেন কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না বলে অনেক উন্নয়নের কাজ আটকে রয়েছে? সেটা কি ঠিক বলেন? তবে এমন হাত খুলে খরচের নির্দেশ কেন দিয়েছে নবান্ন? মানে আপনার সরকার?

তথ্য বলছে, খরচ না করায় জমে থাকা অর্থের পরিমাণ প্রায় ২,২৮২ কোটি টাকা। সেই টাকা অবিলম্বে খরচ না করলে কেন্দ্রের কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষে কি দৈনিক ৬০ কোটি টাকা খরচ করা সম্ভব? কারণ, গ্রাম বাঙ্গলার প্রকল্পে বেশিরভাগ কাজই দুই-তিন লক্ষ টাকার মতো হয়। ছোটো ছোটো অনেক কাজ মিলে অনেক টাকা। সেটা সারা বছর ধরে করা দরকার। কিন্তু সেই কাজগুলো করা হয়নি। এখন যা তা করে খরচ করে ফেললে কেন্দ্র আবার রিপোর্ট দেখে ধরে ফেলবে! শুনলাম, বড়ো বড়ো খরচের মতো কাজ খুঁজছেন সরকারি অফিসাররা।

নবান্নের লোকজন যা বলছেন তাতে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দের পূর্ণ ব্যবহার এখনও কার্যত অধরা। প্রধানমন্ত্রী আবাস বা একশো দিনের কাজের মতো প্রকল্পে বরাদ্দ এখনও বন্ধ থাকলেও, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে বরাদ্দ রয়েছে অবাধ। চলতি আর্থিক বছরের (২০২৩-২৪) প্রথম কিস্তির প্রায় ১৭০০ কোটি টাকাও দিয়েছে কেন্দ্র। আগের টাকাই খরচ হয়নি তো নতুন টাকা দিয়ে কী হবে? সব মিলিয়ে চিন্তা তো হয়ই। সামনেই আবার লোকসভা ভোট। তার আগে খরচে গতি না আনতে পারলে বিজেপি তো ছেড়ে কথা বলবে না। তাই দিদি, আমি বলি কি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যা খুশি খরচ করতে বলে দিন। কিছু একটা হোক। না, সেটা করলেও আবার মুশকিল। কেন্দ্রের এখন যা সরকার ফাঁকি ঠিক ধরে নেবে। চিন্তার। বড়োই চিন্তার বিষয়।

খবরের কাগজে যা পড়লাম তাতে, গত আগস্টের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ বছরে হাতে থাকা অর্থের মধ্যে খরচ হয়েছিল প্রায় ৪৪১ কোটি টাকা, শতাংশের হিসাবে যা মাত্র ১৮.৭৩ শতাংশ। ২০২১-২২ বছরে সেই খরচ ছিল ৪৪.২৪ শতাংশ, যা প্রায় ২৫৫২ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে খরচ হয়েছিল তুলনায় সবচেয়ে বেশি, ৭৯.০২ শতাংশ বা প্রায় ৩৮৩৮ কোটি টাকা। তথ্য অনুযায়ী, এ বছর (২০২৩-২৪) রাজ্যের হাতে এখনও পর্যন্ত রয়েছে প্রায় ৪৩৬৬ কোটি টাকা। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যায়, খরচ না হওয়া অর্থের পরিমাণ প্রায় ২৪৭৪ কোটি টাকা। তার পরেই দৈনিক প্রায় ৬০ কোটি টাকা করে খরচের নির্দেশ দেয় নবান্নের শীর্ষমহল। □

অতিথি কলম

সোমনাথ মুখার্জী

চীনের বি আর আই প্রকল্প ভারতীয় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি

জি-২০ সম্মেলনে ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডরের ঘোষণায় পশ্চিম এশিয়ায় দিল্লির নতুন বাণিজ্যের পথ খুলে দেবে। কিন্তু সবকিছু নির্ভর করবে তার রূপায়ণ ও ভারতের অর্থনৈতিক সাফল্যের উপর।

নিউ দিল্লির দর্শনীয় জি-২০ সম্মেলন দেখে মনে হলো, ভারত যেন কোনো জাঁকজমকপূর্ণ আসর (party) থেকে বেরিয়ে এল। একই রকম ভাবে ২০০৮ সালের বেজিং গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকেও যেমন চীনের বিশাল উপস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়। কৌতূহলবশত, বিভিন্ন দিক থেকে রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে ২০০৮ সালের চীন ও ২০২৩ সালের ভারতের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। অন্তত মোট জিডিপির মাপকাঠিতে চীনের ২০০৭ সাল ও ভারতের ২০২২ সাল অনেকটা একই স্তরের।

ঘটনাচক্রে পুরোপুরি এক না হলেও সম্ভবত জি-২০-র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বড়ো সাফল্য হলো ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর (IMEE-EC)। মধ্যপ্রাচ্যে বন্দর ও রেল করিডর নির্মাণের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বহুমুখী সংযোগের একটি উদ্যোগ। এটি তত্ত্বগতভাবে সুয়েজ ক্যানালের মধ্য দিয়ে বর্তমান বাণিজ্যিক যোগাযোগের একটি বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করবে। প্রকল্পের ধরন ও নকশা অনুযায়ী মনে হয় এটি হলো চীনের মহত্বপূর্ণ বিআরআই (Boats and Rail Initiative)-এর বিকল্প ব্যবস্থা। ভারতীয় BRI (Boats and Rail Initiative) কি চীনের BRI-কে চ্যালেঞ্জ করতে পারে?

তর্কের খাতিরে বলতে বাধ্য, প্রাথমিক ভাবে আর্থিক স্থায়িত্বের অভাবে বিশেষত চীনের বিআরআই প্রকল্প ভারতীয় উপমহাদেশ-সহ সর্বত্র খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। মূলত ভারতীয় মধ্য প্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর (IMEE-EC) হলো আরবের মরুভূমির উপর রেলপথ, সংযোগকারী হিসেবে একদিক থেকে ভারতের সঙ্গে জাহাজের মাধ্যমে সংযোগ এবং অন্য দিকে ইউরোপের সঙ্গে। রেলপথের মাধ্যমে দুবাই ও হাইফা (ইস্রায়েল) বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া অকল্পনীয় ভাবনা কিছু নয়, যদিও এই বিষয়ে সঠিক রূপায়ণে আরও রাজনৈতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন রয়েছে। রেলপথের সমান্তরাল ব্যবস্থা হিসেবে বিদ্যুৎ, হাইড্রোজেন ও ডেটা পাইপের ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এখানে ইউএস মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় এই উদ্যোগটি আর্থিক পুঁজি, প্রযুক্তি, পরিচালনা ও রাজনৈতিক ভাবে খুবই সমৃদ্ধ। আর এর ফলে সাফল্য লাভের সবচেয়ে বেশি সুযোগ রয়েছে। তুলনামূলক ভাবে চীনের বিআরআই-এর তুলনায় আর্থিক অংশীদার হিসেবে ইউএস, ইউএই, সৌদি আরব, ইউরোপ ও ভারত থাকায় সামঞ্জস্যহীন আর্থিক ফলাফলের ঝুঁকি অনেকটাই কম।

> **ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রচলনে জনগণের জন্য অনেক দরজা উন্মুক্ত হবে যা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। সংক্ষেপে বলা যায়, অনেক নৌকো/জাহাজ তৈরি করতে হবে, অনেক রেলপথ নির্মাণ করতে হবে কিন্তু ভুললে হবে না, এটি একটি মহৎ পরিকল্পনা।**

ভারতের পূর্বের প্রচেষ্টায় পরিবহণের মাধ্যমে মধ্য প্রাচ্যের (সেন্ট্রাল এশিয়া) মধ্য দিয়ে ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার চেয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ভারত-মধ্য প্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর (IMEE-EC) ভৌগোলিক-রাজনৈতিক জটিল সমস্যা দূর করতে বেশি কার্যকর হবে। ভারত-পাক সমস্যার কারণে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে সহজ স্থলপথ এখনও স্থায়ীভাবে শুরু করা যায়নি। দীর্ঘ আলোচনা ও কাজ করার পরও ছাবাহার বন্দরের সংযোগ ব্যবস্থা ইরানের ওপর অপরিবর্তনীয় ইউএস প্রতিবন্ধের ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। আরও বেশি মহত্বপূর্ণ প্রকল্প INST (International North-South Transport Corridor) যার মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে ইউরো এশিয়ান স্থলভাগ রেল, রাস্তা ও বন্দরের মাধমে যুক্ত হয়েছে রাশিয়া, সেন্ট্রাল এশিয়া এবং ইরান যেটি ভৌগোলিক রাজনৈতিক ভাবে এমনকী ইউক্রেন যুদ্ধের আগেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ছিল। ভারত-মধ্য প্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর (IMEE-EC) প্রকল্পে এই ধরনের কোনো ভূ-রাজনৈতিক বাধা নেই। বস্তুতপক্ষে এটি চালু হলে মধ্য প্রাচ্যে কিছু রাজনৈতিক স্নায়ুর লড়াই ঠাণ্ডা করতে সমর্থ

হবে এবং ইউএস ও মধ্য প্রাচ্যের মধ্যে কিছু সাম্প্রতিক মোকাবিলা করবে।

কিন্তু IMEE-EC প্রকল্পও একদিক থেকে ব্রিটিশ শাসনের উত্তরাধিকারী ভারত মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকের কাছে অজানা, আঞ্চলিক গঠন অনুসারে আক্ষরিকভাবে মধ্য প্রাচ্য ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতে। লর্ড কার্জন, সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন ব্রিটিশ প্রশাসক ভারতে শাসন করেছেন, ধারণাগতভাবে ব্রিটিশ ভারতের সুরক্ষায় বাফার রাষ্ট্র হিসেবে উত্তরে তিব্বত, উত্তর পশ্চিমে আফগানিস্তান, আরব সাগরে প্রবেশের জন্য পারস্য উপসাগরীয় বন্দর, বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের জন্য মালাক্কাও সুন্দা প্রণালী ব্যবহার করেছে।

'Inventing the Middle East' নামে একটি সুন্দর বইতে ইতিহাসবিদ গিলেমেট ক্রাউজেট বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্য ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। এটির আবিষ্কার হয়েছিল বিশ্ব মানচিত্রের সংকটপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্র বর্ণনার জন্যে। একপ্রকার বিভিন্ন শক্তি কেন্দ্রের জোট এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অনেক রুট তৈরি হয়েছে যা ব্রিটিশ-ভারত ও লন্ডনকে সংযুক্ত করেছে। ব্রিটিশ-ভারতের শিকড় মধ্য প্রাচ্যে এত গভীর ছিল যে দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলের বহু দেশ ভারতীয় রুপির ব্যবহার করতো বৈধ মুদ্রা হিসেবে। এই অভ্যাস বন্ধ হয়েছে মাত্র ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ। মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের কাজের সম্পর্কের ব্যাপারে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়েছে। IMEE-EC অন্তত পক্ষে ভূ-অর্থনৈতিকভাবে কার্জনীয় অংশীদারিত্বের প্রভাব ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সব উদ্যোগ, প্রতিশ্রুতি কার্য সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল। স্টার্টারদের জন্য ভারতের নিজস্ব কার্য সম্পাদন জরুরি।

চীনের ২০০৭ সালের জিডিপি ৩.৫৫ ট্রিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ১২.৩ ট্রিলিয়ন হয়েছে। ভারতের জিডিপি আজকের দিনে ৩.৪ ট্রিলিয়ন। আগামী এক দশকে আমরা কি চীনের জায়গায় পৌঁছাতে পারি?

আজকের দিনে বিশ্ব হলো একটি কৌশলগত জায়গা। এশিয়ার আর্থিক বৃদ্ধির জন্য ওয়াশিংটনের সম্মতি, বিশ্ব আর্থিক রাজনৈতিক চুক্তি যা এখন বিবাদের পর্যায়ে রয়েছে। আজকের দিনে ভারতের ভূমিকা কঠিনতর। উজ্জ্বল দিক হলো নক্ষত্রপুঞ্জে অনুকূল তারকাও রয়েছে। একটা অনিশ্চিত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও স্মার্ট ব্যবসায়ীদের জন্য অনেক সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ব্যক্তি মালিকানা ক্ষেত্রে উৎসাহী (স্মার্ট) ব্যবসায়ীরা বৈশ্বিক স্তরে আরও বেশি পরিমাণ বাণিজ্য করতে পারবে। ভারত একমাত্র প্রধান দেশ যে অনুকূল জনসংখ্যাকে আরও কিছু দিন কাজে লাগাতে সমর্থ হবে। আমাদের ঋণ চক্র (Credit Cycle) অনেকটাই নীচে রয়েছে এবং ব্যাল্যান্সশীট ভালো অবস্থায় রয়েছে। ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রচলনে জনগণের জন্য অনেক দরজা উন্মুক্ত হবে যা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। সংক্ষেপে বলা যায়, অনেক নৌকো/জাহাজ তৈরি করতে হবে। অনেক রেলপথ নির্মাণ করতে হবে কিন্তু ভুললে হবে না, এটি একটি মহৎ পরিকল্পনা।

(লেখক ASK Wealth Advisers-এর মুখ্য বিনিয়োগ আধিকারিক। টাইমস অব ইন্ডিয়ার সৌজন্যে)

শোকসংবাদ

গত ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে মেদিনীপুর শহরের স্বয়ংসেবকদের কাছের মানুষ ও মাতৃসমা ভারতী কুণ্ডু পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। নিঃসন্তান ছিলেন। স্বামী গজেনন্দ্রনাথ কুণ্ডু কয়েক বছর আগেই গত হয়েছেন। গজেনদা সঙ্ঘের পুরনো স্বয়ংসেবক এবং স্বর্গীয় প্রান্ত প্রচারক বসন্তদার পরামর্শ মতো পুরুলিয়া বাগমুণ্ডিতে কল্যাণ আশ্রমের জন্য জমি কিনে দিয়েছিলেন। স্বামী ও স্ত্রী-দুজনের ইচ্ছামতো মৃত্যুর পর শহরের বসত বাটী 'মেদিনীপুর শিক্ষা ও সেবা ভারতী'--- ট্রাস্টের নামে দানপত্র করে গেছেন। এই ভবনটি খুবই পবিত্র, কারণ শ্রীগুরুজী দু'বার পদার্পণ করেছেন। মৃত্যুকালে ভাইয়ের পরিবার ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবকদের রেখে গেছেন। কয়েকদিন আগেও একজনকে ডেকে বলেছেন, স্বয়ংসেবকদের দেখতে ইচ্ছা করছে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। ওঁ শান্তি।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটির অগ্রিম বুকিংয়ের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। যারা স্মারকগ্রন্থটি নিতে ইচ্ছুক অথচ অগ্রিম মূল্য জমা দিতে পারেননি তাদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা ৩৫০ টাকার (মূল্য ৪০০ টাকা) বিনিময়ে গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারেন।

বেলুড়মঠে পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজীর অনুষ্ঠানস্থলেও গ্রন্থটি ৩৫০ টাকার বিনিময়ে বিক্রির ব্যবস্থা থাকবে।

— ব্যবস্থাপক

প্রসঙ্গ : আমেরিকা-রাশিয়ায় ভারতের যৌথ সেনা-মহড়া

কূটনৈতিক পথেই সামরিক সাফল্যের চূড়ায় উঠছে ভারত

বর্তমানে কূটনৈতিক দিক দিয়ে সারা বিশ্বে ভারতের অপ্রতিহত প্রভাব এবার পড়তে চলেছে দেশের সামরিক ক্ষেত্রেও। প্রায় বছর দেড়েক আগে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এখনো থামার কোনো নামগন্ধ নেই। সম্প্রতি ইউক্রেনকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের একটি প্যাকেজ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে আমেরিকা। আর ঠিক তখনই একসঙ্গে দুটি মহাশক্তিধর ও পারস্পরিক শত্রুদেশে সামরিক মহড়ায় অংশ নিতে সেনা পাঠিয়েছে ভারত। একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে আমেরিকা— চিরশত্রু দুটি দেশের সঙ্গেই বর্তমানে দারুণ সম্পর্ক রয়েছে ভারতের, সামরিক মহড়ার কর্মসূচিকে উপলক্ষ্য করে আরও একবার যার প্রমাণ মিলল। এই মহড়ায় অংশ নিতে একইসঙ্গে আমেরিকা-রাশিয়ায় সেনা পাঠাল নয়াদিল্লি।

জানা গিয়েছে, রাশিয়াতে সন্ত্রাস দমনে যৌথ সেনা-মহড়া হয়ে গিয়েছে সদ্য, ২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর। আমেরিকার তুলনায় যদিও রাশিয়ায় কম সৈন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাশিয়ায় পৌঁছেছে ভারতীয় সেনার রাজপুতানা রাইফেলস রেজিমেন্টের জওয়ানদের একটি দল। অত্যাধুনিক যুদ্ধ-কৌশল রপ্ত করতে রাশিয়ার মাটিতে যৌথ সামরিক মহড়ায় অংশ নিয়েছে ভারতীয় সেনার বত্রিশজন জওয়ান। সূত্রের খবর, দিল্লি রাজপুতানা রাইফেলসের অধীনস্থ একটি ব্যাটালিয়নের বত্রিশজন জওয়ানদের নিয়ে গঠিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কাউন্টার টেরোরিজম ফিল্ড ট্রেনিং মহড়া ২০২৩-এ এশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক-সহ এক্সপার্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিয়েছে রাশিয়ায়। প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে খবর, এটি একটি বহুজাতিক যৌথ সামরিক মহড়া যাতে মায়ানমারের সঙ্গে এক্সপার্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সহযোগী হিসেবে হিসেবে অংশ নেবে ভারতীয় সেনা। উল্লেখ্য, এর আগে ২ থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত মায়ানমারের নে পাই তাও-এ সন্ত্রাস মোকাবিলায় এশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠক ও এক্সপার্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সঙ্গে যৌথ মহড়া হয়েছিল।

২০১৭ সাল থেকে অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেশনস (আশিয়ান) দেশগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনা এবং সহযোগিতার অনুমতি দেওয়ার জন্য বার্ষিক বৈঠক করে। ২০১০ সালে ১২ অক্টোবর ভিয়েতনামের হ্যানয় শহরে তা আয়োজন করা হয়েছিল। এই বছর এই গ্রুপের সঙ্গেই আসিয়ানের সদস্য দেশগুলি এই যৌথ মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে। মহড়ায় একটি সুরক্ষিত এলাকায় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে ধ্বংস করা-সহ বেশ কয়েকটি কাউন্টার টেররিজম ড্রিল থাকবে। মহড়ার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির উদ্দেশ্যে একটি কড়া বার্তা দেওয়া। সম্প্রতি জি-২০ মঞ্চ থেকেও বিভিন্ন দেশ সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে কড়া বার্তা দিয়েছে। জি-২০ সম্মেলনের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভারতীয় সেনার এই অংশগ্রহণ সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের তরফের সদর্থক বার্তা বহন করবে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। প্রসঙ্গত, গত বছর প্রায় এই সময়ই রাশিয়া ও তার সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে সাতদিনের সেনা-মহড়ায় অংশ নেয় ভারত। রাশিয়ার সহযোগী দেশগুলির মধ্যে ছিল বেলারুশ, মঙ্গোলিয়া ও তাজিকিস্তান এবং চীনও তাতে ছিল। তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করছেন, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসদমনে চীন যে একেবারেই আন্তরিক নয়, বরং সন্ত্রাসে মদতদাতা আন্তর্জাতিক দুনিয়াকে তা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে ভারত।

কূটনৈতিকভাবে চীনকে চাপে ফেলার পাশাপাশি সামরিক দিক দিয়েও চীনকে বিচলিত করতে চাইছে ভারত। আমেরিকা-রাশিয়ায় যৌথ সেনা-মহড়া তারই ইঙ্গিত বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

রাশিয়ার পাশাপাশি মার্কিন ফৌজের সঙ্গে আলাস্কায় একটি ড্রিলে অংশ নিচ্ছে ভারতীয় সেনা। যার পোশাকি নাম 'যুদ্ধাভ্যাস'। কূটনৈতিক দিক থেকে একে নয়াদিল্লির মোক্ষম চাল বলে উল্লেখ করছেন বিশেষজ্ঞরা। গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ৮ অক্টোবর পর্যন্ত আমেরিকার আলাস্কায় চলবে সামরিক মহড়া। সেখানে অংশ নিচ্ছে ৩৫০ জন ভারতীয় সেনা। এরা সকলেই মারাঠা লাইট ইনফ্রেন্টি রেজিমেন্টের সদস্য। শেষবার যৌথ সামরিক মহড়ায় অংশ নিতে ভারতে এসেছিল মার্কিন ফৌজ। উত্তরাখণ্ডের আউলিতে হয় সেই মহড়া। চীনের সঙ্গে যে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বা এলএসি রয়েছে, তার থেকে এই অঞ্চলের দূরত্ব ছিল একশো মিটারেরও কম। সবমিলিয়ে কূটনৈতিকভাবে চীনকে চাপে ফেলার পাশাপাশি সামরিক দিক দিয়েও চীনকে বিচলিত করতে চাইছে ভারত। আমেরিকা-রাশিয়ায় যৌথ সেনা-মহড়া তারই ইঙ্গিত বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

ধর্মনিরপেক্ষতার কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ঘোরী তৈমুর চেঙ্গিজের বংশজরা

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠি

আচ্ছা নূপুর শর্মাকে মনে আছে? সুপ্রিম কোর্টের সেই ডাকাবুকো অ্যাডভোকেট, বিজেপি দলের রাষ্ট্রীয় প্রবক্তা? সেই নূপুর শর্মার কথা বলছি। গত বছর যিনি একটি টিভি চ্যানেলে এসে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। যার জেরে সারা দেশে আগুন জ্বলে উঠেছিল? এই বঙ্গপ্রদেশেও উত্তর থেকে দক্ষিণ এমন কোনো জেলা ছিল না যেখানে এর আঁচ লাগেনি। বাড়ি-গাড়ি-দোকান-বাজারে আগুন, বিজেপির অফিস ভাংচুর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ন্যাশনাল হাইওয়ে অবরোধ— এসবই হয়েছিল নিশ্ছিদ্র পুলিশি নিরাপত্তায়। শুধু ওই সম্প্রদায়ের মানুষই নয়, বিরোধী দলগুলিও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। পথে নেমেছিল বুদ্ধিজীবী মহল। মোমবাতি গ্যাং, 'আওয়ার্ড বাপসি' গ্যাঙের সদস্যরা দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস ছেড়ে গর্ত ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। স্লোগান উঠেছিল নূপুর শর্মার 'শার তন্ সে জুদা' শাস্তি চাই। রাজস্থানে তো এর শুভযাত্রা হয়েছিল এক গোবেচারা হিন্দু দর্জির গলায় ছুরির কোপ বসিয়ে। এহেন প্রতিবাদের তোড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিজেপি সেদিন নূপুর শর্মাকে শুধু দায়িত্ব থেকে সরিয়েই দেয়নি, শেষ পর্যন্ত দল থেকে বহিষ্কার করতেও বাধ্য হয়েছিল। কি, এবার মনে পড়েছে, না? জানি, বাঙ্গালির স্মৃতিশক্তি একটু দুর্বল হলেও, সে কিন্তু জড় বুদ্ধি নয়। একটু খেই ধরিয়ে দিলে ঠিক মনে পড়ে যায়।

ঠিকই তো, চাচা-মহাত্মার 'একই বৃন্তে দুই কুসুমের' পদ্মবনে নূপুর শর্মা নামে এক অর্বাচীন সম্প্রদায়িক মত্ত-হাতি দেশের 'ভাইচারা' নষ্ট করবে এ তো হতে দেওয়া যায় না। প্রতিবাদের সঙ্গত কারণ আছে বৈকি। বিজেপিও নাকে খত দিয়ে নূপুরকে তাড়িয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে, ঠিক করেছে। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু ছন্দ কাটল ঠিক এক বছর পর। যখন গত ১ সেপ্টেম্বর বিরোধীদের ২৩টি দলের ইন্ডি-জোটের (I.N.D.I.A. Allaiance) মুম্বাই বৈঠকের পরের দিন এর দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক ডিএমকে নেতা তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্তালিনের পুত্র ক্রীড়ামন্ত্রী উদয়ানিধি চেন্নাইয়ের এক 'মহতী' সভায় এসে ভাষণ দিলেন। অনুষ্ঠানের শীর্ষক ছিল Eradication Of Sanatan Dharma। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'সনাতন ধর্মের সমূল নাশ'। ব্রেভো, বাঃ কি উচ্চ মার্গের চিন্তা! সনাতন ভারতে বসে ভারতের 'আইডেন্টিটি' সনাতন ধর্মের সমূলে নাশ করার সেমিনার। হ্যাঁ বন্ধু, এটাই ডবল কুসুমের মাহাত্ম্য।

এই মহতী আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে সেদিন শ্রীমান উদয়বাবু নূপুর শর্মার চেয়েও চোখা চোখা বাক্যবাণে সনাতন হিন্দু ধর্মের সর্বনাশ কামনা করেছেন। বলেছেন, 'সনাতন ধর্ম হলো ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া কোভিডের সমান। তাই শুধু সনাতন ধর্মের বিরোধ করলেই হবে না, একে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলতে হবে'। না, এমন ভাববেন না যে তিনি হঠাৎ উত্তেজনার বশে মুখ ফসকে কথাগুলো বলে ফেলেছেন। কারণ ভাষণটি তিনি কাগজে লিখে এনে পড়ছিলেন। অর্থাৎ যা বলেছেন সজ্ঞানে ঠাণ্ডা মাথায় সচেতন ভাবেই বলেছেন। প্রশ্নটা অন্য। ইন্ডি-জোটের মুম্বই বৈঠকের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তাদের যুব নেতার মুখে এহেন মন্তব্য আসলে কিসের ইঙ্গিত? তাদের ২০২৪-এর ম্যানিফেস্টো কি তবে আগাম ফাঁস হয়ে গেল? কারণ এই বক্তব্যের পরে পরেই জোটের অন্যান্য নেতাদের মতামতও এসে গিয়েছে। যেমন, ডিএমকে মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্তালিন বলেছেন— উদয় অনেক সফট্ কথা বলেছে, দ্রাবিড় আন্দোলনের জনক পেরিয়ার এর চেয়েও কড়া শব্দে সনাতনের বিনাশ চেয়েছেন। ওই দলেরই ডি রাজা আরও এক কাঠি সরেস, বলেছেন— সনাতন শুধু ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া বা করোনাই নয়, বরং এ হলো এইচআইভি, এইডসের সমান।

প্রশ্ন হলো নূপুর শর্মার সময়ে যারা 'হেট্ স্পিচ' 'হেট্ স্পিচ' বলে পাড়া মাথায় করছিলেন, পদ্ম-পদ্মশ্রী-পদ্মভূষণ-পদ্মবিভূষণ বস্তা থেকে বের করে রাস্তায় ঢেলে ফেলেছিলেন, যে মোমবাতি গ্যাঙের জ্বালায় দোকানে বাজারে শপিংমলে অকালে মোমবাতির আকাল লেগেছিল, হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে এত কটূকথার পর তারা সব গেলেন কোথায়? বেঁচে আছেন তো? নাকি তাদের মতে 'উদয়ের-বাণী' নূপুর কাণ্ডের প্রতিবাদের পর নিদ্রা গিয়েছেন। আবার যখন BJP-RSS-VHP-র নেতারা কোনো বেফাঁস কথা বলবে তখনই জাগবেন। একেবারে কুম্ভকর্ণ মডেল।

ইন্ডি-জোটের দলগুলিও এদের পিঠোপিঠি মৌনীব্রত ধারণ করেছে। বাঙ্গলার দিদিভাই চুপ, দিল্লির সোনিয়া চুপ, ইউপির অখিলেশ চুপ, বিহারের লালু-নীতীশ চুপ, অন্ধ্রের জগন্মোহন চুপ, তেলেঙ্গানার কে চন্দ্রশেখর চুপ। তবে নিজেরা চুপ থেকে ধূর্ত নীতীশবাবু তাদের হয়ে ক্রস ব্যাটে খেলতে নামিয়েছেন তারই মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী চন্দ্রশেখর যাদবকে। হুঁ হুঁ বাবা, সংখ্যালঘুর মন রাখতে না পারলে আগামী বিধানসভায় যে ভিটে মাটি চাঁটি হয়ে যাবে। তখন কি হবে? সেই চন্দ্রশেখর মহোদয় উদয়ের চেয়েও দু-কদম এগিয়ে বলেছেন, 'হিন্দুর রামচরিতমানস হলো পটাশিয়াম সায়ানাইডের চেয়েও ভয়ংকর বিষ'। ব্যাস সব দিক সামলে গেল। তবে এই ব্যাপারে সবচেয়ে করুণ অবস্থা বোধহয় তথাকথিত হিন্দু মসীহা বালঠাকরের 'প্রিম্যাচিওর বেবি' উদ্ধব ঠাকরের। ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টজনিত কারণে ভালো করে বুদ্ধি ফোটেনি। তাই এই অবস্থায় ঠিক কি বলা উচিত, কি করা উচিত কোনো মতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা। তাই তিনিও চুপ।

তবে সজ্ঞানেই হোক বা অজ্ঞানেই হোক আসল সত্যটা প্রকাশ করে দিয়েছেন

ফঃ ২

ডিএমকের আর এক গুণধর মন্ত্রী কে কোলমুড়ি। তিনি বলেছেন, 'ইন্ডিয়া জোটের জন্ম হয়েছে সনাতন ধর্মের বিরোধিতা করবার জন্য। সহযোগী দলগুলির অন্য বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু সনাতনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সকলে একজোট'। কি বুঝলেন? ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে কিনা? ইন্ডি-জোটের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কত সাবলীল ভাষায় ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন কোলমুড়ি? যে সনাতন ধর্মকে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ শক্তির উৎস মেনেছেন, যাকে হাতিয়ার করে সমাজের কুরীতি নিরসনের প্রয়াস করেছেন, যে সনাতন ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু— তাকে আজকের ইন্ডি-জোট সমূলে ধ্বংস করার সংকল্প করেছে। যে সনাতন সংস্কৃতি ছিল তথাকথিত দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মহর্ষি বাল্মীকির কর্মের আধার, 'রামায়ণের' ভক্তিরসের উৎস ধারা— সে কিনা' ডেঙ্গুর সমান? যে সনাতন ছিল বনবাসী মাতা শবরীর আত্মপরিচয় সে কিনা ম্যালেরিয়ার সমান? যে রবিদাস জাতে চর্মকার হয়েও সনাতনের সাধনায় জীবনপাত করে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের কাছে সদা প্রণম্য— সে কিনা এইডসের সমতুল্য? যে সনাতন থেকে প্রেরণা নিয়ে লোকমান্য তিলক সারা দেশে গণেশ উৎসবের প্রবর্তন করলেন, মা ভারতীকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখলেন সে হলো করোনার সমান? যে সনাতনকে হাতিয়ার করে গান্ধীজী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, দলিতদের হরির অংশ 'হরিজন' বলে সম্মান জানালেন, রামধুন গাইলেন, মৃত্যুর আগে 'হে রাম' বলে ভূপতিত হলেন— সে কিনা এইচআইভি-র সমতুল্য? হায়রে হতভাগার দল!

দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। প্রথমে ঘোষণা হয়েছিল ইন্ডি-জোট তৈরি হয়েছে মোদীর বিরুদ্ধে পড়তে, গণতন্ত্র বাঁচাতে, বেরোজকারী খতম করতে, দ্রব্যমূল্য রোধ করতে। কিন্তু দিন যত গড়ালো আলখাল্লার ভিতর থেকে হিংস্র দাঁত নখ সব বেরিয়ে পড়ল। এখন সবকিছুই জালের মতো পরিষ্কার। আসলে এই জোট তৈরি হয়েছে সংখ্যালঘু তোষণের ল্যাবে সনাতন হিন্দু ধর্ম ধ্বংস করার ভাইরাস তৈরি করতে। যা দিয়ে এদেশের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি-আধ্যাত্মিকতাকে ধ্বংস করা যায়। যে কাজ বিগত হাজার বছর ধরে চেঙ্গিজ, নাদিরশা, তৈমুর, আবদালি, বাবর, মামুদ, আলাউদ্দিন, বখতিয়াররা করতে পারেনি, একহাতে কোরান অন্য হাতে তলোয়ার দেখিয়েও যাকে বশ মানানো যায়নি— সনাতন অমরই রয়ে গেছে— তাকে এরা শেষ করার ব্রত নিয়েছে।

এখন কথা হলো সনাতনের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে প্রধান সেনাপতি কে? ডিএমকে, কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী, জেডিইউ, আরজেডি, সিপিএম না অন্য কেউ? উদয়ের ঝাঁজে কংগ্রেসের এখন প্রায় নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। রোমান ক্যাথলিক ম্যাডামের অন্তরের 'গোপন কথাটি ওপেন করে' উজবুক ছোঁড়াটা কি বিপদেই না ফেলেছে তাদের। সারা দেশে আজও ৮৫ শতাংশ সনাতনীর বাস। তার অসময়ে এই উজবুকি উক্তি তামিলনাড়ুতে হয়তো দু-এক শতাংশ ভোট বেশি টানতে পারে, কিন্তু সারা দেশে? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং, বিজেপি, মায় দেশের মঠ মন্দিরের সাধু-সন্তরাও যেভাবে এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে তাতে তারা ফেঁসে গেছে। ২০২৪ বিহার, ইউপি, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গে জনগণের প্রশ্নের উত্তর দিতে তো আর উদয়ানিধি আসবে না? রাহুল নীতীশ তেজস্বী মমতা অখিলেশকেই দিতে হবে। সেদিন কি উত্তর দেবে তারা?

তৃণমূলকে যখন হিন্দু ভোটাররা জিজ্ঞেস করবে মাকালীর পূজা করা কি ডেঙ্গুর সমান— তখন কি উত্তর দেবে মমতা? দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরা যখন জিজ্ঞেস করবে শিবের আরাধনা করা কি ম্যালেরিয়ার সমান— তখন কি উত্তর দেবে স্তালিন-কেসিআর-চন্দ্রশেখররা? বিহারের হিন্দুরা যখন জিজ্ঞাসা করবে কৃষ্ণের আরাধনা করা কি করোনার সমান— তখন কি উত্তর দেবে নীতীশ লালু তেজস্বীরা? মহারাষ্ট্রের হিন্দুরা যখন প্রশ্ন করবে গণেশ পূজা কী এইচআইভির সমান, তখন কি উত্তর দেবে উদ্ধব, শারদ পাওয়ারেরা? যখন উত্তরপ্রদেশের হিন্দুরা প্রশ্ন করবে রামের জন্মভূমিতে রাম ও বজরংবলীর উপাসনা করা কি এইডসের থেকেও মারাত্মক বিষ, তখন কি উত্তর দেবে পিনারাই বিজয়নরা? সুট-কোটের উপর 'পৈতেধারী' দত্তাত্রেয় গোত্রের ইচ্ছাধারী ব্রাহ্মণ রাহুলকে ভোট প্রচারের সময় দেশের লোক যখন জিজ্ঞাসা করবে— যে মাটিতে ভগবান শিব, রাম, কৃষ্ণ জন্ম নিয়েছেন, লীলা করেছেন, সে দেশে সনাতন ধর্মে আস্থা রাখা কি মহাপাপ, তখন কি উত্তর দেবে সে? আর আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির এই গর্বিত বঙ্গের ভোট ভিক্ষাজীবী বাম-কংগ্রেস নেতারা যখন হিন্দুর ঘরে ঘরে ভোট চাইতে যাবে। তখন যদি প্রশ্ন ওঠে, যে বাঙ্গালি রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, গৌড়ীয় মঠ, ইস্কন, মতুয়ামহাসঙ্ঘ, সন্তানদল, সৎসঙ্গ, লোকনাথ ভক্ত বলে পরিচয় দেয়— নিজেদের সনাতন হিন্দু বলে গর্ব অনুভব করে তারা সবাই নিকৃষ্ট-পাপিষ্ঠ— তখন কী উত্তর দেবে সুজন বিকাশ শতরূপ অধীরেরা? ভোটের সময় বিজেপি তো দেশের মানুষকে দিয়ে এই প্রশ্নগুলোই করাবে। সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, খাঁচায় ইঁদুর পড়েছে। পালাবার পথ নেই। এই ভরা শরতে বিজেপির 'বসন্ত এসে গেছে, আর ইন্ডি-জোট ফেঁসে গেছে'।

শেষে বলি, বাপু উদয়, মন দিয়ে শোনো। তোমার পূর্বপুরুষ চেঙ্গিজ তৈমুর ঘোরীরা হাজার বছরে যা পারেনি, তোমার মেন্টর সোনিয়া মাইনোর জাতভাইদের কাছে ১৯০ বছরের শাসনেও যা অধরা থেকে গেছে, এমনকী তোমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা পেরিয়ারের শত চেষ্টার পরেও যে কাজ সম্ভব হয়নি, সেই সনাতনকে তুমি এদেশের বুক থেকে মুছে দেবে? বোকা ছেলে। সনাতনকে কী শেষ করা যায়? এ যে বিশাল অক্ষয় বট। যতবার মুড়িয়ে কাটতে যাবে ততবারই সে নতুন করে শাখাপ্রশাখা মেলে পল্লবিত হবে। তাইতো তার নাম সনাতন। যার ক্ষয় নেই, ধ্বংসও নেই। তার চেয়ে বলি কী, ভোর হতে খানিক বাকি আছে। তুমি বরং ততক্ষণে ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ো। সনাতন ধ্বংসের বাকি স্বপ্নটাও দেখে নাও। তারপর যখন সূর্যোদয় হবে, ২০২৪ আসবে, তখন জেগে উঠে দেখবে তোমার বাপের রাজ্যে পেরিয়ারের বংশে বাতি দেওয়ার দু-গাছা লোকও আর অবশিষ্ট নেই। সবাই সনাতনী হয়ে গেছে। হিন্দুরাষ্ট্রের শঙ্খনাদ করছে, ভারতমাতা কি জয় বলছে। আর দিল্লির রাজসিংহাসনে তখন তৃতীয়বারের জন্য আসীন হয়েছেন হিন্দু হৃদয় সম্রাট সনাতন রক্ষক নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। সেদিন তুমি বুঝবে আসলে এ দেশটা সনাতনেরই। ❑

পরিকল্পিত নুহ হিংসার পিছনে ছিল সাইবার ক্রাইম

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

চলতি বছরের ৩১ জুলাই হরিয়ানার নুহ জেলায় শুভ শ্রাবণ সোমবারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্রজ মণ্ডল জলাভিষেক শোভাযাত্রায় উন্মত্ত জেহাদি জনতা পাথর ছোঁড়ে, গাড়িতে আগুন দেয়, 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে থাকে। তারা এক হোমগার্ডকে গুলি করে হত্যা এবং ১২ জন পুলিশ কর্মী ও আধিকারিককে আহত করে। ফলে হরিয়ানার বিভিন্ন অংশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল।

মুসলমান জনতা তাদের দিকে পাথর ছুঁড়তে শুরু করলে শোভাযাত্রীদের মধ্যে মহিলা ও ভিএইচপি কর্মী-সহ ২৫০০ জন নুহ মন্দির চক ও কিছু ভবনে আটকে পড়েন। যাত্রীদের কয়েকজন গুলিতে আহত হয়েছেন। বেশ কয়েকটি ভিডিয়োতে দূর থেকে মুসলমান জনতার আক্রমণ, গুন্ডামি ও পোড়া যানবাহনের ধোঁয়া দেখা যায়। খালিদ, সাকির, আবরার, সামেরি, বদরুদ্দিন, আরিফ, মোয়েন, জিশান, আশফাক, শাহরুখ, সরফুদ্দিন এবং নিয়ুমকে এফআইআর-এ অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

ভিএইচপি সভাপতি অলোক কুমার পুলিশ-প্রশাসনকে সত্বর ওই কয়েকটি স্থানে আটক হিন্দুদের উদ্ধার করার আবেদন জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এই শোভাযাত্রা প্রতি বছর হয়। কিন্তু এ বছরে তার উপর পরিকল্পিত ও সংগঠিত আক্রমণ করা হয়েছে, এটা বোঝা যায় কারণ শোভাযাত্রার দুই দিন আগে থেকে মুসলমান জনতা পাথর সংগ্রহ করছিল এবং তারা এখানকার বেশ কয়েকটা হিন্দু মন্দিরে হামলা চালিয়ে অপবিত্র করেছে।

তিনি আরও বলেছিলেন যে তাদের কর্মীরা যথাসময়ে পুলিশকে ধর্মীয় মিছিল সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। সহিংসতার পরে পুলিশ তৎপর হয়ে উদ্ধারের চেষ্টা করেছে। ভুল তথ্য ও গুজব রটনা রুখতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে।

সমস্যার উৎপত্তি : স্বাধীনতার সময়ে পাকিস্তানের পঞ্জাব থেকে সব হিন্দুদের বিতাড়ন করা হয়েছিল। অন্যদিকে তৎকালীন ভারতের পঞ্জাব থেকেও যথাসম্ভব মুসলমানদের বিতাড়ন করা হয়েছিল। সেই সময়ে দিল্লির কাছাকাছি মেওয়াত অঞ্চলে (যেটা রাজস্থান, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের লাগোয়া সীমানা বরাবর অবস্থিত, মেও মুসলমানরা থাকে বলে মেওয়াত নাম) দিল্লির জামা মসজিদ এলাকা থেকে প্রচুর মুসলমানকে মেওয়াত অঞ্চলে বসানো হয়। হরিয়ানার নুহ এই মেওয়াত অঞ্চলের অন্তর্গত একটা পাহাড়ি শহর। এখানে প্রায় শতকরা আশি ভাগ মুসলমান, বাকি হিন্দু। হিন্দুরা লাগাতার মুসলমান অত্যাচারে অতিষ্ঠ।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলকে সতর্ক করেন যে দিল্লি থেকে ঘণ্টাখানেক দূরে এই সংখ্যাগুরু মুসলমান প্রধান অঞ্চল আইনশৃঙ্খলার পক্ষে মাথাব্যথার কারণ হবে। এদের পঞ্জাবের অন্য স্থানের মুসলমানদের মতো পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা হোক। প্যাটেল ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হন। গান্ধী ও নেহরু বাদ সাধেন। 'তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন করতে হবে।' তারা এখানে থেকে যায়। এরা ছিল প্রথম থেকে কট্টর পাকিস্তানপ্রেমী ইসলামপন্থী।

গণ্ডগোলের উৎপত্তি : পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড সীমানায় অবস্থিত ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া শহর সাইবার ক্রাইমের এক বড়ো উৎস। এখান থেকে বহু সাইবার ক্রাইম চালানো হয় পশ্চিমবঙ্গ-সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে। তার থেকেও বড়ো সাইবার অপরাধের উৎস নুহ-সহ মেওয়াত অঞ্চল।

এই বছর মে মাসে হরিয়ানা পুলিশ বলেছে 'সাইবার অপরাধীরা ৩৫টা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত

অঞ্চলে ২৮০০০ মানুষের সঙ্গে ১০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণা করেছে। তারা জাল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিত'। ২৭-২৮ এপ্রিল মধ্যরাতে পুলিশ নুহ শহর ও আশপাশের ১৪টা গ্রামের ৩২০টা স্থানে অভিযান চালিয়ে ৬৬ জন সন্দেহভাজন প্রতারককে গ্রেপ্তার করে। পরে আরও ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মোট ৫০০০ পুলিশ কর্মী-সহ অপরাধ রুখতে এটা অন্যতম বৃহৎ সাইবার পুলিশী অভিযান।

পলাতকদের মধ্যে রাজস্থানের ২০ জন, উত্তরপ্রদেশের ১৯ জন এবং হরিয়ানার ২১১ জন রয়েছে। ধৃতদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে; তারা বেশিরভাগ উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। সারাদেশে সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে ১৩৪৬টি মামলা হয়েছে। অভিযানে পুলিশ ১৬৬টি জাল আধার, পাঁচটি প্যান, ১২৮টি এটিএম কার্ড, ৬৬টি মোবাইল ফোন, ৯৯টি সিম কার্ড, পাঁচটি পিওএস মেশিন, তিনটি ল্যাপটপ, ৫টি মাইক্রো-এটিএম মেশিন-সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইটি ডিভাইস জব্দ করেছে। 'এই ডিভাইসগুলি সম্ভবত সাইবার অপরাধ চালাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ৭৩৯টি জাল সিম কার্ড, ৩০৭টি জাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ১৯৯টি ইউপিআই হ্যান্ডেলের বিবরণ-সহ অসংখ্য জাল নথি উন্মোচিত হয়েছে।'

হরিয়ানা পুলিশের মতে এই জালিয়াতরা নানা ফিকিরে লোক ঠকাত, যেমন ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে জাল প্রোফাইল তৈরি করে হানি ট্র্যাপ ও ফেসবুক বা ওএলএক্স-এর মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যের বিক্রয়-সহ বিজ্ঞাপন পোস্ট করা। গত তিন বছরে রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সাইবার অপরাধের উৎপত্তি হয়েছে, তারপরে উত্তরপ্রদেশের মথুরা এবং হরিয়ানার নুহ। জেলার এসপি বরুণ সিংলা বলেছেন যে জেলার অপরাধীরা প্রায়শই ইউপির মথুরা এবং রাজস্থানের আলওয়ারকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করে। 'তারা জানে ধাওয়া করার জন্য আমাদের অন্য রাজ্য পুলিশের অনুমতি লাগবে। তারা সুবিধার জন্য আন্তঃরাজ্য সীমানা কৌশলগত ভাবে ব্যবহার করে'। এই অভিযানের পরে হরিয়ানার সাইবার অপরাধের অভিযোগ ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

হিন্দুস্তান টাইমস মে মাসে রিপোর্ট করেছে যে তিন রাজ্যে বিস্তৃত মেওয়াত অঞ্চল ভারতে সাইবার অপরাধীদের নতুন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নিউজ ১৮-এর মতে বেকারত্ব, পশ্চাদপরতা ও অপর্যাপ্ত সুযোগ মেওয়াতে সাইবার জালিয়াতি ও অন্য অপরাধ বৃদ্ধি করেছে।

জলাভিষেকের অকুস্থলের কাছের থানায় আক্রমণ না করে তারা মাঝের আরও তিনটে থানা, যার একটি মহিলা থানা, টপকে সাইবার থানাকেই বেছে নিয়েছিল কেন? ৩১ জুলাই ২০২৩-এ ইসলামপন্থীরা পুলিশের সংগৃহীত সাইবার অপরাধের প্রমাণ নষ্ট করতে সাইবার পুলিশ স্টেশন আক্রমণ করে। পুলিশ জানিয়েছে সাইবার থানায় আক্রমণ পূর্ব পরিকল্পিত। তাই তারা যা পেয়েছে সব কিছু লুটপাট, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।

সাব-ইন্সপেক্টর সুরজের অভিযোগের ভিত্তিতে নথিভুক্ত এফআইআর-এ উল্লেখ আছে কীভাবে ইসলামিক দাঙ্গাকারীরা নুহ সাইবার ক্রাইম থানা আক্রমণ করে পুলিশ কর্মীদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল।

সুরজ, পিএসআই সুধীর, হেড কনস্টেবল গুলশান, কনস্টেবল রঘুবীর সিংহ, রবিকান্ত ও শুভম সাইবার থানায় ছিলেন। সহস্রাধিক দাঙ্গাবাজ মুসলমান জনতা হঠাৎ থানা ঘিরে পাথর ছুঁড়তে থাকে। 'ওদের জীবন্ত পুড়িয়ে দাও' বলে স্লোগান. দিচ্ছিল। সদর এসআই দিগ্বিজয় সিংহ তাভড়ু ও সহযোগী এক বোলেরোতে বসেছিলেন। তারা কোনোমতে পালিয়ে থানায় আশ্রয় নেয়। এসময় দাঙ্গাকারীরা পাথর ছুঁড়তে থাকে। দাঙ্গাকারীরা হাইজ্যাক করা একটি হলুদ বাস ব্যবহার করে থানার দেওয়াল ও প্রধান ফটক ভেঙে ফেলার জন্য। তারা থানার দেওয়াল ও ছাদে উঠে অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করে পুলিশ কর্মীদের হত্যার লক্ষ্যে গুলি চালায়।

সুরজ ও তার সহকর্মী প্রাণ বাঁচাতে প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়েছিলেন। কনস্টেবল প্রদীপ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়েন, কিন্তু আক্রমণ অব্যাহত থাকে। পুলিশ আত্মরক্ষায় বাতাসে গুলি ছোঁড়ে। পুলিশ মোট ১০৫ রাউন্ড গুলি ছোড়ে।

মুসলমান জনতা যানবাহন জ্বালিয়ে দিতে শুরু করে। পেট্রোল ব্যবহার করে পুড়িয়ে দেওয়া হয় সরকারি-বেসরকারি গাড়ি। তারা থানা চত্বরের গাড়িও ভাঙচুর করে, একটি বাইক-সহ পাঁচটি গাড়ি পুড়িয়ে দেয় ও দশটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত করে। তারা একটি প্লাস্টিকের কুলার, একটা ইনভেস্টর, ব্যাটারি, ল্যাপটপ এবং ৫০০০ টাকা নগদ ও গুরুত্বপূর্ণ নথি লুট করে। তারা মেসের দেয়াল, থানা ও ওয়াশরুমের ছাদের জলের ট্যাংকগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ততক্ষণে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী থানায় পৌঁছে যায়। 'দাঙ্গাকারীরা আমাদের মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।' আহত হন হেড কনস্টেবল সুরেন্দ্র ও শুভম। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৮, ১৪৯, ৩৩২, ৩৫৩, ১৮৬, ৪২৭, ৪৩৫, ৪৩৬, ৩৯৫, ৩৯৭ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারায় এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।

হরিয়ানা পুলিশ এখন নিশ্চিত যে থানায় হামলাটি হিংসার এই আক্রমণশৃঙ্খলের প্রথম ঘটনা। এর পরে আরও হবে। 'অপরাধীরা পুলিশী অভিযানে প্রাপ্ত বাজেয়াপ্ত প্রমাণগুলো ধ্বংস করতে হিংসার ছদ্মবেশে সাইবার থানায় পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছিল।' উল্লেখ্য হরিয়ানা পুলিশ রাজ্যের ২৯টি সাইবার থানায় ৩১৮টি সাইবার হেল্পডেস্ক স্থাপন করেছে।

রয়টার্স প্রতিবেদক মিস সালেদাকিস সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করেন, 'এই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ নিয়ে আপনার কোনো মন্তব্য আছে?' মজার বিষয় তিনি একথা এড়িয়ে যান যে মুসলমানরাই হিন্দুদের এক ধর্মীয় মিছিলে হামলা করেছিল এবং নুহ শোভাযাত্রার এই আক্রমণের ফলে ৬ জন নিহত হয়েছে।

গত ৩ আগস্ট সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী বলেছেন যে হরিয়ানা বিধানসভা কক্ষে কংগ্রেস বিধায়ক মাম্মান খানের 'উস্কানিমূলক বক্তব্য' এবং তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলো হিংসার ঘটনায় তার দলের ভূমিকা স্পষ্ট করে। এছাড়াও মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়া হয়।

হরিয়ানা সরকার দাঙ্গাবাজ এবং বাংলাদেশীদের অবৈধ কুঠি ২০০-র বেশি ভেঙে দিয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে হরিয়ানার মেওয়াত গত কয়েক বছর ধরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি, গোরু চোরাচালান এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তরণের জন্য আলোচনায় উঠে এসেছে। নুহ ভারতে সাইবার অপরাধীদের জন্য শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রগুলির অন্যতম। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছিল। ◘

দেশকে ভারত নামেই ডাকতে হবে

তরুণ কুমার পণ্ডিত

সারা দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে— আমাদের দেশের নাম ভারত থাকা উচিত না ইন্ডিয়া। মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষ মানব সভ্যতার সুতিকাগার। ভারত বিশ্বের সকল দেশের গুরু। ভারতবর্ষ দেবভূমি, পুণ্যভূমি, কর্মভূমি ও মোক্ষভূমি। এই দেশের নাম যে ভারত, এটা বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জানে। বিষ্ণু পুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে— 'উত্তরং যদ্ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্। বর্ষং তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ'।। অর্থাৎ যে ভূমিখণ্ড সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে, তা ভারতবর্ষ নামে পরিচিত সেখানে ভারতের সন্তানরা বাস করেন। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি অরবিন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে ভারতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

বিবেকানন্দ তাঁর স্বদেশ মন্ত্রে লিখেছেন, 'হে ভারত, এই পরানুবাদ,পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাস সুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা— এইমাত্র সম্বল করিয়া তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা— স্বাধীনতা লাভ করিবে?

হে ভারত, ভুলিও না— তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত, সদর্পে বলো— আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বলো মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই— বলো ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন রচনায় বার বার এই দেশকে ভারত বলে উল্লেখ করেছেন। শিবাজী উৎসব কবিতায় তিনি লিখলেন, 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যান্বেষী কবি। তিনি বললেন, 'হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।' গোড়ায় কবিতার নাম ছিল 'মাতৃ-অভিষেক'। পরে রবীন্দ্রনাথের ভারতবোধ হলো প্রস্ফুটিত, নিজেই পরিবর্তন করে কবিতাটির নাম দিলেন 'ভারততীর্থ'— 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে/এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' ভারতভূমি বরাবরই তাঁর কাছে ছিল পুণ্যভূমি, পুণ্যতীর্থ। প্রশ্ন উঠতে পারে কবি কেন এই দেশটাকে মহামানবের সাগরতীরে বলে মনে করলেন? উত্তর হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্য একটি প্রবন্ধের কয়েকটি ছত্রের উল্লেখ করা যায়— কবি রাজা রামমোহন রায়কে বলেছিলেন ভারতপথিক। ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথরূপে। ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'হিন্দুমেলা' রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম।' হিন্দুমেলায় দেশের স্তবগান ও দেশাত্মবোধক অন্যান্য অনুষ্ঠান হতো। দ্বিতীয় বছর মেলার উদ্বোধন হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারতসন্তান' গানটি দিয়ে। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হোক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হোক। গানটির কথাগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক :

মিলে সব ভারতসন্তান
একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শত খনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়।

তাছাড়াও আমাদের জাতীয় সংগীতের মধ্যে তিনি 'ভারতভাগ্য বিধাতা' বলে উল্লেখ করে দেশের নাম যে ভারত তার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন ইন্ডিয়ার ভারতবর্ষ উত্তরণ। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা আন্দোলনে লড়েছিল ইন্ডিয়া হতে নয়, মহাভারতের সাধনার ভারত গঠনের স্বপ্ন নিয়ে। অরবিন্দ চেয়েছিলেন, সাহেবি রীতিনীতি থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয়ত্বে ভাস্বর হয়ে আমাদের গীতার মন্ত্রে, সত্যের পথে, ধর্মের রথে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি সারা জীবন ভারতবর্ষকে কেবলমাত্র একখণ্ড ভূমি হিসেবে না দেখে জীবন্ত সত্তা এবং অখণ্ড ভারতের পূজারি হিসেবে শেষ জীবনে পণ্ডীচেরিতে কাটিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে সংবিধানে এই দেশকে ইন্ডিয়া হিসেবে পরিচয় দেওয়ার আগে এটি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের নামেই পরিচিত ছিল। অতএব ভারত নামের প্রাচীনত্বকে মর্যাদা দিতে এবং একই দেশের দুটি নামের বিভ্রান্তি দূর করতে দেশের নাম ভারত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অনেকেই বলছেন ইন্ডিয়ার পরিবর্তে ভারত নামটি সরকারি ভাবে স্বীকৃতি দিলে এবং ব্যবহার করলে দেশের অনেক টাকা খরচ হবে এবং সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। আমার বক্তব্য পরিষ্কার, তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, শ্রীলঙ্কা যদি ব্রিটিশদের দেওয়া নাম সিলোন পরিবর্তন করতে পারে, বর্মা যদি মায়ানমার হতে পারে, পারস্য যদি ইরান হতে পারে, হল্যান্ড যদি নেদারল্যান্ড হতে পারে এবং আমাদের রাজ্যগুলির নামে বোম্বাই যদি মুম্বই হতে পারে, ক্যালকাটা যদি কলকাতা হতে পারে, মাদ্রাজ যদি চেন্নাই হতে পারে তবে ইন্ডিয়া পরিবর্তন হয়ে ভারত হতে পারবে না কেন? আসলে সম্পূর্ণ দেশ ও জাতিকে যারা আজ ভুল পথে চালাচ্ছে, প্রতিনিয়ত আত্মবিস্মৃত হতে শিক্ষা দিচ্ছে, তাঁদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। ভারতের বাইরে ভারতীয়দের থাকবার স্থান নেই। তাই ভারতবর্ষকে ভারত নামেই ডাকতে হবে। ▯

ক্রেতা সুরক্ষা রক্ষায় আদালতগুলি আগের তুলনায় অধিক সক্রিয় হয়ে উঠেছে

শেখর সেনগুপ্ত

আমরা গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। শ্রীশ্রী ব্রহ্মময়ীর কৃপায় এ দেশের নাগরিকদের বহুবিধ অধিকার রয়েছে, যাদের নিয়ে খোলাখুলি চর্চায় বসলে, কিছু প্রায় অজানা তথ্যও আমাদের গোচরে আসে এবং বিলম্বিত গতিতে হলেও আমরা বহু মূল্যবান বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারি— যাদের অন্যতম হলো ক্রেতা ও বিক্রেতাদের পারস্পরিক আইনসিদ্ধ ক্ষমতা এবং তাদের যথাযোগ্য প্রয়োগ। জনসমাগমে মুখ্যত রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের নেতা-নেত্রীরা প্রভূত বাক্য প্রয়োগ করলেও নাগরিকদের প্রকৃত ও এমন অধিকার সম্পর্কে একটি বাক্যও নিজের করেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে আইন আইনই এবং নিজের স্বার্থেই প্রত্যেকের উচিত ক্রেতাসুরক্ষা বিধি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হওয়া।

যতদিন একজন সিনিয়র আধিকারিকরূপে দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে দায়িত্ব পালন করেছি, প্রত্যেক গ্রাহক অথবা উপভোক্তাকে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি। অনেক খুঁটিনাটিকে স্মরণে রাখতে হয়; বিচলিত হলে চলে না। বিশেষত নাগরিকদের অধিকার রক্ষার্থে প্রস্তুত সংবিধানকে বার বার আনতে হবে স্মরণে। সেই সংবিধানের একদিকে রয়েছে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ— যাদের ক্ষুণ্ণ করা হলে বঞ্চিত নাগরিক তাঁর অধিকার ফিরে পেতে আইনি ব্যবস্থাদি গ্রহণে অগ্রগামী হতেই পারেন।

অন্যদিকে সেই নাগরিকদের প্রতি

রয়েছে কিছু নির্দেশিকাও। নির্দেশগুলি চরিত্রে ন্যায়নিষ্ঠ, সামান্যতমও গ্লামারাস নয়। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের সার্কিটে থাকতে হলে এই ন্যায়বোধ থাকা দরকার। ক্রেতাসুরক্ষা বিধি ওই দুই সাংবিধানিক অংশের সঙ্গেই জড়িত। যেহেতু সকল মানুষের স্বভাবগত ব্যবহার ও বাসনা একই ধরনের হয় না, তাই সংবিধান ও আইনকে শালগ্রামশিলার মান্যতা দিতেই হয়। আর কানুন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলীয়ভাবে নেতিয়ে থাকে না। কঠিন থেকে কঠিনতর করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতারকদের মুডঅফ-এর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অতীতে এবং বর্তমানে। অতঃপর তা আরও শক্তি সঞ্চয় করবে ভবিষ্যতে। এই প্রসঙ্গেই বলি, ভারত যেহেতু হিন্দুপ্রধান দেশ, আমাদের আইন প্রণালীতেও তাই ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার বিকাশ অনস্বীকার্য। এই দেশে আজ অবধি ক্রেতা এবং উপভোক্তাদের জন্য যে সকল কানুন বর্মের মতো সুরক্ষা দিতে প্রস্তুত, আমি তাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটিকে তুলে ধরছি নাগরিকদের হিতার্থে :

ক্রেতা/উপভোক্তা নিজেকে প্রতারিত মনে করলে তিনি যেন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন না করেন; অন্যথায় দেশে প্রতারকদের প্রাধান্য ক্রমে বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। বর্তমানে কেন্দ্রে যে দল ক্ষমতায় রয়েছে, সেই দলের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার এই নিয়ে ব্যাপক প্রচারও চালানো হয়েছে। প্রথমেই জানা দরকার, নালিশ জানাবেন কারা? সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে নালিশ নথিভুক্ত করবার অধিকার এঁদের :

(ক) ব্যক্তিগতভাবে একজন ক্রেতা বা উপভোক্তা।

(খ) ক্রেতার যদি ভুল চিকিৎসার কারণে মৃত্যু হয়, তাঁর প্রতিনিধি অথবা আইনসিদ্ধ উত্তরাধিকারী।

(গ) রেজিস্টার্ড ক্রেতা সমিতি।

(ঘ) কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকার।

নালিশ জ্ঞাপনের পক্ষে নিম্নোক্ত কারণগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ :

(১) কোনও ব্যবসায়ী অথবা পরিষেবা প্রদানকারী যদি অসাধু হন অথবা উৎপাদনের গুণমানে নিম্নস্তরীয় মিশ্রণ ঘটান অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে।

(২) বিক্রিত পণ্যে যদি খুঁত ধরা পড়ে।

(৩) পরিষেবা প্রদানে যদি শর্ত পূরণ না করা হয়।

(৪) যদি মোড়কে লিখিত মূল্যের চেয়ে ক্রেতার নিকট হতে অধিক মূল্য আদায় করা হয় বা দাবি জানানো হয়।

কোথায় ক্রেতা অথবা উপভোক্তা নালিশ জানাবেন, সেইগুলি সম্পর্কে অবহিত করছি অতঃপর :

(ক) দাবির পরিমাণ যদি ২০ লক্ষ টাকার বেশি না হয়, অভিযোগ দায়ের করতে হবে জেলা ফোরামে।

(খ) ক্ষতিপূরণের দাবি যখন ২০ লক্ষ টাকা ছাড়াচ্ছে, কিন্তু ১ কোটি টাকার মধ্যেই থাকছে, অভিযোগ জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিশনে।

(গ) আর দাবির অঙ্ক ১ কোটি টাকাকে অতিক্রম করলে, তখন সেই দাবি জানাবার একমাত্র স্থান হলো জাতীয় কমিশন।

এই তিনটি সংস্থাই দেওয়ানি আদালতের সমকক্ষ। দু' পক্ষেরই বক্তব্য শোনা হয় সেখানে। তদনুযায়ী আসে আদেশ।

অভিযোগ পেশের পদ্ধতি সরল। তবে অভিযোগের সঙ্গে ক্যাশমেমো সমেত অন্যান্য নথিপত্রাদির ফটোকপি যেন থাকে।

ক্রেতা আদালতে শুনানি পর্ব শেষ হলে অভিযোগ যদি সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা পায়, আদালত নিম্নোক্ত এক বা একাধিক নির্দেশ দিতে পারে—

- উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ;
- খুঁতবিশিষ্ট দ্রব্যকে বদলে নিখুঁত বস্তু প্রদান;
- মূল্য ফেরত;
- অসাধু ব্যবসায়ীর ব্যবসাকে বন্ধ করে দেওয়া;
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্রেতা প্রতিকার লাভের জন্য যে অর্থ ব্যয় করেছেন,তা তাঁকে ফেরত দেওয়া;
- বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনকে সংশোধন

আইনের পরিচিতি	কার্যকরী কোন বছর থেকে
• কৃষি উৎপাদন ও তাদের মান নির্ণায়ক বিধি	১৯৩৭
• ওষুধ ও প্রসাধনী আইন	১৯৪০
• ওষুধ নিয়ন্ত্রণ আইন	১৯৫০
• ওষুধ সম্পর্কে আপত্তিকর বিজ্ঞাপন আইন	১৯৫৪
• অত্যাবশ্যক পণ্য আইন	১৯৫৫
• ক্রেতা সুরক্ষা আইন	১৯৮৬
• ভারতের মানক কার্যালয় আইন	১৯৮৬
• কালোবাজারি দমন আইন	১৯৮০
• ওজন ও মাপ সম্পর্কিত আইন	১৯৭৬
• মোড়কবন্দি পণ্য বিষয়ে আইন	১৯৭৭
• ট্রেডমার্ক আইন	১৯৯১
• প্রতিযেগিতা আইন	২০০২
• সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য আইন	২০০৩
• খাদ্য নিরাপত্তা ও মান আইন	২০০৬

করে : বিক্রেতা/নির্মাতাকে সঠিক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই প্রকৃত সত্যকে জনগণের গোচরে আনতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশবাসীকে ক্রেতাসুরক্ষা বিধির প্রতীক্ষায় থাকতে হয়েছে ৩৯টি বছর। অর্থাৎ ঠগবাজদের ঠোঁটে হাসির সুস্মিত রেখাকে প্রশ্রয়ই দিচ্ছিলেন তৎকালীন সরকার। ক্রমে বিষয়টির বিষ এতই মাত্রাহীন হয়ে পড়ে যে অসাধু সুবিধাবাদী ব্যবসায়ীদের সংযত করতেই সরকার নিয়ে এলেন ১৯৮৬ সালে ক্রেতাসুরক্ষা আইন। এটা কোনও মায়া-মমত্বের অভিপ্রকাশ নয়। বিরোধীদের ক্রমাগত চীৎকার এবং প্রতারিত জনতার ক্ষোভ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সংসদে ওই বিধিকে উত্থাপন করতে।

সেই আইন পণ্যের মানক তথা গুণমান নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নেয়। লক্ষণীয়, সংসদে গৃহীত হলেও সেই বিধিকে কার্যকর করতে সরকার কেন্দ্রে ক্রেতা বিষয়ক দপ্তর গঠন করেন আরও পাঁচ বছর বাদে অর্থাৎ জুন, ১৯৯১ সালে। কিছু গোপন কথা সামনে চলে আসায় বিভিন্ন ক্রেতা-কল্যাণ প্রকল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রেতাকল্যাণ তহবিলও গঠিত হলো ১৯৯২ সালে। চিকিৎসা পরিষেবায় প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল না। ক্রমে এই নিয়ে সংসদে আলোড়ন ওঠায় সেখানেও ক্রেতার অধিকারকে মান্যতা দেন সরকার এবং ১৯৯৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চিকিৎসা পরিষেবাকে সর্বাংশে টেনে আনা হলো ক্রেতা সুরক্ষা আইনের আওতায়। কোর্টেরই হস্তক্ষেপ এমত ক্রেতা সুরক্ষা আইনকে আরও বলশালী করে তোলেন সরকার ১৫ মার্চ, ২০০৩ থেকে।

বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় সততা এনেও যে পেশীকে স্ফীত করা যায়, তা নিশ্চিত করতে সরকার ৩১ মার্চ, ২০০৩ নিয়ে আসে বিশেষ প্রতিযোগিতা বিধি/কমিশন। ওই বছরই সিগারেট সমেত তাবৎ তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপনে বিশেষ নিষিদ্ধবার্তা প্রকাশ বাধ্যতামূলক করেন সরকার। দু'বেলা দুটো খাবারও যাঁদের জোটে না, তাঁদের তামাকজাত বিষদ্রব্য থেকে রক্ষা করতে সরকার সদা সচেতন এবং এই বিষয়ে ব্যাপক প্রচারও চলছে প্রথমাবধি। কিয়ৎক্ষণ চর্চা চালিয়ে আপনারা নিম্নোক্ত বিষয় তথা প্রয়াস সম্পর্কে অবহিত হবেন নিজেদেরই কল্যাণার্থে :

(ক) শিল্প-বাণিজ্যে ক্রেতা অভিযোগ খেল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

(খ) আমেদাবাদে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ামক কমিশনের প্রোডাক্ট টেস্টিং অ্যান্ড রেটিং নির্ধারক ল্যাবরেটরির বিষয়ে অবহিত থাকা।

(গ) ক্রেতাসুরক্ষা বিধি ভঙ্গের জন্য যে সকল মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে, তাদের রায়গুলিকে নিজস্ব চর্চার মধ্যে রাখার প্রয়াসকে অব্যাহত রাখা।

(ঘ) বাজারে ডিজিটাল বা সংখ্যাগত লেনদেন অনেকেই করে থাকেন। তাঁদের নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে অবহিত থাকাটা বাঞ্ছনীয় :

- Bharat Interface for Money
- Unified Payment Interface
- Immediate Payments Transfer.

ক্রেতাসুরক্ষাকে রক্ষার জন্য সরকার সচেষ্ট। কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ পদে আসীন আছেন একজন কমিশনার। তাঁর অধীনে পাঁচজন উপ-কমিশনার এই সকল কর্মস্তরকে মসৃণ রাখতে :

(ক) পণ্য এবং পরিষেবাকে এমন পোক্ত অবস্থায় রাখা, যাতে কোনও সাধু কিংবা অসাধু প্রয়াসে তারা মাটির ভাঁড়ের মতো ভেঙে না পড়ে।

(খ) পণ্যের গুণমান রক্ষিত থাকবে এমন ভাবে যে একটি কিশোরী বালিকাও সেই সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারে।

(গ) ক্রেতাসুরক্ষা বিধি থেকে কোনও পক্ষই যেন সামান্য তফাতেও সরে আসবার সুযোগ না পায়।

(ঘ) বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন, মিথ্যা দৃশ্যাবলীর প্রচার ইত্যাদি যেন বন্ধ থাকে।

(ঙ) ক্রেতা ও উপভোক্তাদের যথাযথভাবে দ্রব্যাদি সম্পর্কে যেন অবহিত করা হয়। ক্রেতাসুরক্ষা রক্ষায় আমাদের আদালতগুলি যে আগের তুলনায় অধিক সক্রিয় হয়ে উঠেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে, এই বিষয়ে সহযোগীরা আমার সঙ্গে সহমত হবেন বলে মনে করি। মামলার বিষয়গুলিতে সংযোজনের মাত্রাও বেড়ে চলেছে। ক্রেতাসুরক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘও সক্রিয়; কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতা ও বিক্রেতা দুটি ভিন দেশের নাগরিক হতে পারেন। সেই রকম ক্ষেত্রে বিবাদ গড়াতে পারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ অবধি। তাই এই সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘ জারি করেছে যে নির্দেশিকা, তার পরিচিতি এই রূপ :

United Nations Guidelines for Consumer Protection (সংক্ষেপে UNGCP)।

এই প্রস্তাব রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় গৃহীত হয় ১৬ এপ্রিল, ১৯৮৫। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই তামাম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি যাতে আপন আপন ক্রেতাসুরক্ষা বিধি কার্যকর করে, সেই বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুরোধ যথাকালে পৌঁছে গিয়েছে ভারত সমেত সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা সমেত তাবৎ ক্রেতাসুরক্ষা বিধি বর্তমান ভারতে অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। তবে এখনও আরও কড়া নজর রাখতে হবে স্বাস্থ্য পরিষেবায়, — যেখানে লোভ ও দুর্নীতির প্রভাব আজও ব্যাপক। চিকিৎসার নামে শোষণ একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে পুরোদমে। এখানে অধিকাংশ উপভোক্তরাই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে যথাযথভবে সচেতন নন। এই সন্ধিক্ষণে রচিত ও বিধি Universal Health Coverage নিয়ে আরও যে সচেতনতা দরকার, তা অনুধাবন করেই বর্তমান বিজেপি সরকার ২০১৭ সালে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়েছে। এর মূল কথাই হলো, 'জাগো গ্রাহক জাগো'। ক্রেতারা তাদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন। বিচ্যুতি হচ্ছে দেখলেই সঠিক পদ্ধতিতে অভিযোগ জানান। প্রতিবিধান মিলবেই। ▮

তদন্তের নামে রাজনীতির খেলা বন্ধ হোক

পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ রাজ্য। দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে বামশাসনকাল ছিল। এই শাসনকালে প্রথম দিকে গরিব, পরিশ্রমী মানুষের জন্য অনেক কিছু করলেও পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন তেমন কিছু হয়নি। তাই পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ সুশাসন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবর্তন করেছিলেন। কিন্তু একটা সরকার ক্ষমতায় এসেই দু-তিন বছরের মধ্যে সারদার মতো বড়ো আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গেল। একাধিক নেতা, মন্ত্রীরা এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত বলে শোনা যায়। কোর্টের নির্দেশে সারদা তদন্ত সিবিআই করছে। কিন্তু প্রথমদিকে এই তদন্ত গতিপ্রাপ্ত হলেও সময়ের সঙ্গে তার গতিপ্রকৃতি শ্লথ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে সারদা তদন্ত দশ বছর ধরে চলছে। যখন ভোট আসে তখনই অভিযুক্তদের ডাকাডাকি শুরু হয়। আবার ভোট মিটে গেলেই সব চুপচাপ। কিন্তু সাধারণ মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠ করে যারা আজ কোটি টাকার মালিক তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

তারপর ২০১৬ সালে প্রকাশ হলো নারদা স্টিং অপারেশন। সেখানে জনপ্রতিনিধিদের প্রকাশ্যে হাতপেতে টাকা নিতে দেখা যায়। এখানেও কোর্টের নির্দেশে সিবিআই ও ইডি তদন্ত করছে। অনেক নেতা, মন্ত্রীকে ডাকাডাকি করা হয়েছে, কিন্তু কারও বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না। যেখানে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ জানতে চায় দুর্নীতির আসল রহস্য। তারা দিনের পর দিন অপেক্ষা করছে দুর্নীতিবাজদের উপযুক্ত শাস্তি হবে। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক ভাবে 'খাঁচায় বন্দি তোতা পাখির মতো' সিবিআই যেন পরিচালিত হচ্ছে। তাই ভোট এলেই তারা অভিযুক্তদের ডাকাডাকি শুরু করেন এবং একটা গিমিক তৈরি করেন এই বুঝি অপরাধীকে জেলে পুরে দেবেন। কিন্তু ভোট পর্ব কেটে গেলেই এদের সক্রিয়তা আর দেখা যায় না। ২০১৯ সাল থেকে আবার এই রাজ্যে সবচেয়ে বড়ো কেলেঙ্কারি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি ধরা পড়লো। এবারেও মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত চলছে। বেশ কয়েক বছর ধরে ডাকাডাকি হচ্ছে। কিছু হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীকে জেলের ভাত খেতেও হচ্ছে।

তদন্ত সঠিক পথে হলে আসল সত্য বের করতে এতো সময় লাগার কথা নয়। নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে। বহু মেধাবী যোগ্য ছেলে-মেয়েরা চাকরি পায়নি। কোটি কোটি টাকা লেন-দেন হয়েছে। সবকিছু জনসমক্ষে প্রচার হচ্ছে। কিন্তু ইডি ও সিবিআই তদন্তের নামে রাজনীতির খেলা করছেন। বিচারপতিরা পর্যন্ত তাদের ভর্ৎসনা করছেন। আসলে এদেরকে যারা নিয়ন্ত্রণ করছেন তারা এই তদন্তের নামে রাজনীতির খেলাটা দীর্ঘদিন চালিয়ে যেতে চাই। বঙ্গপ্রদেশ তথা সারা ভারতবর্ষের মানুষ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। কয়লা গোরু, সারদা, নারদা দুর্নীতির তদন্তগুলোকে রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত না করে এ রাজ্যের মানুষের স্বার্থে যথার্থ তদন্ত করা হোক। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আসল সত্য জানতে চায়। এ রাজ্যের জনপ্রতিনিধিদের নামে যে এতো কিছুর দুর্নীতির কাদা ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ এ পর্যন্ত কোনোকিছু প্রমাণিত হয়নি। আর ভবিষ্যতে যদি এইসব দুর্নীতি ইডি সিবিআই প্রমাণ করতে না পারেন তবে এই বঙ্গপ্রদেশকে ও বঙ্গের দশকোটি সাধারণ মানুষের অপমানের দায় নিতে হবে। তাই তদন্তের নামে রাজনীতির খেলা না খেলে আসল সত্য উদ্‌ঘাটন করুন। আসল দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোণা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

দেশের নাম 'ইন্ডিয়া' বর্জন, জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ

ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশের বিভিন্ন কারণগুলি আমরা অনুধাবন করলে দেখতে পাই আজও আমাদের পরাধীনতার গ্লানি মোচন, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য সরকার পক্ষ ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে সেই ঔপনিবেশবাদী রীতিনীতি জাতীয়তাবোধ বিরোধী চিত্রগুলির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন— ইন্ডিয়া না ভারত, নতুন বিতর্ক উসকে দিল জি-২০ সম্মেলনের আমন্ত্রণপত্র। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য আয়োজিত নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্রে দ্রৌপদী মুর্মুর পরিচয় 'প্রেসিডেন্ট অব ভারত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজিতে রাষ্ট্রপতিকে প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া' বলে সম্বোধন করাই প্রচলিত রীতি।

সেই রীতি বদলের পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে বলে বিরোধীদের ধারণা। ইন্ডিয়া নামে বিরোধী জোট তৈরি হওয়ায় শব্দটি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিরোধীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে বিজেপি নেতারা অবশ্য বিরোধীদের যুক্তি মানতে নারাজ। দলের রাজ্যসভার সাংসদ হরনাথ সিংহ যাদবের পালটা প্রশ্ন, এক দেশের দুটি নাম কেন থাকবে। তাঁর মতে ইন্ডিয়া একটি বিদেশি শব্দ। ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে যুক্ত। তাই দেশের নাম ভারত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

পক্ষান্তরে ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশের বিভিন্ন কারণগুলি অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাবো। আজও আমাদের পরাধীনতার গ্লানি মোচনে বিশেষ বিশেষ

ফঃ ৩

ক্ষেত্রে আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক ভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য সরকার পক্ষ ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে সেই ঔপনিবেশবাদী রীতিনীতি জাতীয়তাবোধ বিরোধী চিত্রগুলির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ভারতীয় সংস্কৃতি কাব্যে-কবিতায়, গানে ও বিভিন্ন রীতিনীতির মধ্যে, ভারতমাতা, ভারত আমার ভারতবর্ষ কবিতার পংক্তিতে, গানের ভাষাতে ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে, তাই দেশের নাম 'ভারত' হওয়াই যুক্তিযুক্ত ও ঔপনিবেশিকতাবাদ মুক্ত বলে মনে করি।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা-২,
কোচবিহার।

স্বপ্নদীপের মৃত্যু এক গভীর প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দেয়

স্বপ্নদীপের মৃত্যু শিক্ষাঙ্গনে এক গভীর প্রশ্ন দিয়ে গেছে। ছোপ ছোপ রক্ত, বুকফাটা কান্নায় বঙ্গ কেমন থমথমে হয়ে গেছে। আমি এখন র‍্যাগিঙের মানে খুঁজতে অভিধান দেখছি কারণ এ তো বাংলা শব্দ নয়, বিদেশি শব্দ। কী মানে? 'কৌতুকের নামে অত্যাচার।' 'মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অর্থ সংগ্রহের জন্যে আয়োজিত হাস্যকৌতুকপূর্ণ অনুষ্ঠান।' র‍্যাগিঙের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এখন ইন্ট্রো, তার মানে একেবারে নরকের দ্বার বলা যায়। মানসিক, শারীরিক অত্যাচার-সহ অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ চলতে থাকে যতি চিহ্নহীন মৃত্যু পর্যন্ত। বিদেশিদের নিষ্ঠুর অপসংস্কৃতি আমাদের শিক্ষাঙ্গনে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যাদবপুরি কালচার মানে নাকি র‍্যাগিং কালচার। হোস্টেলে সিনিয়র দাদারা নতুনদের র‍্যাগিঙের নাম করে শারীরিক, মানসিক অত্যাচার চালায়। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির এই র‍্যাগিং দীর্ঘদিনের অসুখ ক্যানসারের মতো কেউ নাকি সারাতে পারে না। র‍্যাগিঙে অনেকের মৃত্যু হয়। তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণা দেখতে নাকি ভালোবাসে তথাকথিত পণ্ডিত সিনিয়র রক্তপিপাসু ছাত্র-ছাত্রী দাদা-দিদিরা। তাদের মুখে কথার খই ফোটে। মুখে অনবরত জ্বলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া। মুখে প্রগতিশীলতার বাণী। মনে হয় সাক্ষাৎ দেবদূত সামনে এসে হাজির হয়েছে।

পৃথিবীর যতো জ্ঞান তাদের পকেটে। তাদের জন্যে পৃথিবীতে জ্ঞানের সংকট দেখা দিয়েছে কারণ তারা তো সব জ্ঞান দখল করে নিয়েছে। দিল্লির জেএনইউ থেকে আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল যাদবপুর ইউনিভার্সিটির হোস্টেলগুলো মদ-গাঁজা-হেরোইন-চরসের ঠেকে পরিণত হয়েছে। গর্ভ নিরোধকের প্যাকেটও পাওয়া যায়। যাদবপুরের হোস্টেল একদল লম্পটদের আড্ডাখানা বলা যায়। আমরা সকলে জানি ওই হোস্টেল আফিঙের স্বর্গ রাজ্য। দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের নামে দেশবিরোধী কাজে মদত দিচ্ছে। সেখানে সিসি টিভি নেই। পুলিশ ফাঁড়ি নেই। হোস্টেল সুপারের সুপারগিরি ওই সিনিয়ার ছাত্র-ছাত্রীরা বরদাস্ত করে না। ওই সিনিয়র দাদা-দিদিরাই সেখানে শেষ কথা বলে। তারা কেন আইনের বাইরে? পাশ আউট হয়ে যাওয়ার পরেও তারা বছরের পর বছর হোস্টেল দখল করে থাকে। তাদের কেউ হোস্টেল থেকে তাড়াতে পারে না। তারা কেউ কেউ বাবা সেজে হোস্টেল পাইয়ে দেবার নাম করে তোলা তোলে। কতকগুলো মানবিকতাহীন, বিকৃত মানসিকতা, বিদ্বেষভরা ছাত্র-ছাত্রীরা ইউনিভার্সিটির পড়াশোনার পরিবেশকে ধ্বংস করছে। তারা আন্দোলনের নাম করে শিক্ষা জগতের আকাশ বাতাস কলুষিত করছে। স্বপ্নদীপের মতো কত ছাত্রের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে এই ইউনিভার্সিটির আঙিনা। মায়েদের বুকফাটা কান্না, হাহাকার তাদের কানে কখনো কখনো পৌছায় না। দীর্ঘ বাম জমানা থেকে শুরু করে তৃণমূল সরকারের শীতঘুম বিস্ময় উদ্রেক করে। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। সতীদাহ প্রথার মতো এই প্রথা রদ করার জন্যে আর একজন রামমোহন দরকার? র‍্যাগিঙের ওষুধ খুঁজতে আমার মনে হয় যোগীর বুলডোজার যথেষ্ট। একবার প্রয়োগ করলেই সবই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। স্বপ্নদীপের মতো যে সমস্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা অজ গ্রাম-গঞ্জ থেকে এখানে পড়তে আসে তাদের স্বপ্ন পূরণ হবে। স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মতো কেউ আর অকালে ঝরে যাবে না।

এখন প্রশ্ন, যে সমস্ত গ্যাং এই র‍্যাগিং চক্রের সঙ্গে যুক্ত তারা সাজা পাবে তো, না সহজে ছাড়া পাবে? খুনের চক্রান্ত, খুনে মদত দেওয়া, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা, প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা ইত্যাদি ধারায় অভিযুক্ত করতে হবে। যারা এটাকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করছে তাদেরকেও জেরা করতে হবে যাতে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসে এবং প্রকৃত খুনিদেরকে চিহ্নিত করা যায়। এমন সাজা দিতে হবে যেন ভবিষ্যতে এমন বীরত্ব দেখানোর আগে একবার অন্তত ভাববে। এই র‍্যাগিং মাস্টাররা দামি দামি জমকালো জামা প্যান্ট পরে শিক্ষিত হয়েছে, শিক্ষা পায়নি। মানুষ হয়েছে, মনুষ্যত্ব পায়নি। তাদের তো ইউনিভার্সিটির থাকার কথা নয় জঙ্গলে থাকার কথা। দুর্ভাগা এ বঙ্গের, কী করে এমন কুলাঙ্গারদের জন্ম হয় এখানে আমাদেরকে ভাবায়। দুর্ভাগ্য আমাদের এই এমন নির্মম নৃশংস, পৈশাচিক দৃশ্য দেখতে হচ্ছে। র‍্যাগিং বন্ধ করে, বন্ধ করতে হবে ছাত্র আন্দোলনের নাম করে তাদের এই বেয়াদপি, নৈরাজ্যতা। এখন থেকে হোক কলরব আর নয়, বন্ধ হোক র‍্যাগিং।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

প্রথম সংসদের কয়েকজন মহিলা সাংসদ

সুতপা বসাক ভড়

বিধানসভা এবং সংসদে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন অবশেষে সংরক্ষিত হলো। এর ফলে মহিলাদের সার্বিক পরিস্থিতি উন্নত থেকে উন্নততর অবস্থায় পৌঁছাবে, এমনটাই আশা করা যায়। মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরাধীন ভারতেও আলোচিত হয়েছিল; যদিও ব্রিটিশরা যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিল আমাদের ওপর তাদের শাসনভার চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। ১৯৩৫ সালে Goverment of India Act, একচল্লিশটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করে। এর মধ্যে কিছু প্রাদেশিক আইনসভা এবং কিছুটা কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ৮০ জন মহিলা সংসদে যান। ওই সময় আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পরে ভারতের সংসদেই সব থেকে বেশি সংখ্যায় মহিলাদের অংশগ্রহণ দেখা যায় এবং পরবর্তীকালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

স্বাধীন ভারতের সংসদ থেকে মহিলাদের সংরক্ষণ সরিয়ে দেওয়া হয়, শুধুমাত্র তপশিলি জাতি ও জনজাতিদের জন্য সংরক্ষণ রাখা হয়। স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে। সেখানে মহিলারা ৪.৪ শতাংশ আসনে জয়যুক্ত হয়ে নির্বাচিত হন। যদিও তাঁদের সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু তাঁরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন এবং স্বাধীন ভারতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করেন। প্রথম লোকসভার ৪৯৯টি আসনের মধ্যে ২২টি-তে মহিলারা জয়যুক্ত হন। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন অভিজাত পরিবারভুক্ত। এঁরা হলেন— রাজকুমারী অমৃত কৌর, সুভদ্রা যোশী, সুচেতা কৃপালনী, আম্মু স্বামীনাথন, অ্যানি মাসকেয়ারনে। প্রথম লোকসভার প্রমুখ মহিলা ছিলেন এঁরা।

কৌর স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং মারাগাথম চন্দ্রশেখর ডেপুটি মিনিস্টার অব হেলথ্ রূপে নিযুক্ত হন। কাপুরথালা রাজপরিবারের সদস্যা কৌর একজন গান্ধীবাদী ছিলেন। ভারতের স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিকাঠামো গঠনে তাঁর বিশেষ অবদান আছে। খাবারে ভেজাল বিষয়ক সমস্যা ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে, তিনি প্রথম তুলে ধরেন, পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে এটি একটি আইনে পরিণত হয়।

রাজকুমারী অমৃত কৌর

সুচেতা কৃপালনী,

সুভদ্রা যোশী,

আম্মু স্বামীনাথন,

অ্যানি মাসকেয়ারনে,

তাঁর মুখ্য অবদান ছিল, তিনি যে বিল আনেন, সেখানে প্রস্তাব রাখেন, ভারতে একটি বড়ো এবং উচ্চমানের চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধিত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা নিজস্ব উচ্চমান বজায় রেখে শিক্ষাদান এবং গবেষণার মতো মহৎ কাজে লিপ্ত থাকবেন, এমনটাই তিনি চেয়েছিলেন। যুবক-যুবকেরা সেখান থেকে শিক্ষিত হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসার মাধ্যমে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। ১৯৫৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি যখন এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, তখন তা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়। কিন্তু ওই বছরই মে মাসে তা মেনে নেওয়া হয় এবং AIIMS-এর মতো প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়।

যৌতুক নিবারণ বা 'Dowry Prohibition Bill' লোকসভার মহিলা সদস্যদের আনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল। ১৯৫১ সালে এই বিলটি আনেন Bombay Suburban Constituency থেকে জয়শ্রী রাইজী এবং উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর থেকে উমা নেহরু। যদিও এ বিষয়ে আলোচনা হয় ১৯৫৩ সালে, আইন তৈরি হয় অনেক পরে, ১৯৬১ সালে।

বল্লভভাই প্যাটেলের কন্যা মনিবেন প্যাটেল মহিলা-শিশু পাচার সংক্রান্ত বিষয়টি সংসদে আলোচনা করেন। অনাথালয় এবং মহিলা আশ্রয় কেন্দ্রগুলি নানা অসামাজিক কাজের সঙ্গে অনেকসময় যুক্ত থাকে, ফলস্বরূপ মহিলারা এবং ছোটো বাচ্চারা বিষম পরিস্থিতির শিকার হয়। ওই সংস্থাগুলির যথেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং লাইসেন্স দেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেশ কয়েকটি তর্ক-বিতর্ক সভার পরে ১৯৫৬ সালে এই বিষয়ক বিলটি পাশ হয়।

মহিলাদের দ্বারা আনা বিলগুলি ওই সময়ের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট থেকে রেণু চক্রবর্তী ১৯৫৬ সালে সমপরিমাণ শ্রমের জন্য সমপরিমাণ অর্থ এমন প্রস্তাব আনেন।

জয়শ্রী রাইজীর মতো সাংসদ মহিলাদের পুরুষদের সম- অধিকারের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন। আইনের মাধ্যমে মহিলাদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। এছাড়া The Workmen's Compensation Bill (1955), The Factories (Amendment) Bill, The Indian Adoption of Children Bill, The Hindu Marriage (Amendment) Bill-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি মহিলা সাংসদরাই প্রথম সংসদে আনেন। অতি সম্প্রতি সংসদে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আনা মহিলা সংরক্ষণ বিলটি প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। এই আইন এদেশের মহিলাদের সার্বিক উন্নতি করবে এই আশা করছি।

গরম খাবার দেখলেই যেন আতঙ্ক

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

অতিরিক্ত গরম খাবার খাওয়ার 'অনেকের অভ্যেস আছে। কাপে গরম চা দেওয়া মাত্রই এক চুমুকে পেয়ালা শেষ। সদ্য কড়াই থেকে ভেজে নামানো গরম শিঙাড়া, কচুরি বা চপ অনেকেই দিব্যি খেয়ে ফেলেন। খেতে বসে দশ-বারোটা কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে খান। এই ধরনের অভ্যেস মারাত্মক ক্ষতিকারক। এতে জিভের স্নায়ুগুলো একেবারেই অকেজো হয়ে যায়। তখন খুব গরম বা খুব ঝালের অনুভব থাকে না। বারবার অতিরিক্ত গরম ও ঝালের দাপটেও গ্লসাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

খাবার দেখলেই যেন আতঙ্ক। চিবিয়ে যেন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। গ্লসাইটিস হলে এমন যন্ত্রণাদায়ক সমস্যায় পড়তে হয় বইকি! যদিও মুখের ভিতর চট করে সমস্যা হয় না, কারণ স্যালাইভা বা লালার মধ্যে লাইসোজাইম নামক এনজাইম আছে যা ব্যাকটিরিয়ানাশক। তাই অধিকাংশ পশুকে ক্ষতস্থান চেঁছে পরিস্কার করতে দেখা যায়। এটি এক প্রকার প্রাকৃতিক সুরক্ষা। তবু বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থের জন্য, ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক আক্রমণের বা কিছু ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাবে গ্লসাইটিস হতে পারে।

কী করে বুঝবেন গ্লসাইটিস বাসা বেঁধেছে

গ্লসাইটিস হলে গরম, নোনতা ও ঝাল খাবার খেতে গেলে মুখের মধ্যে জ্বলে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা অনুভূত হয়। অনেক সময়ে গিলতেও কষ্ট হয়, স্বাদ চলে যায়। কথা বলতেও অসুবিধা হয়। এই রোগে জিভের রং টকটকে লাল হয়ে যায়। কখনও জিভ ফুলে গিয়ে ব্যথা হতে পারে। জিভের উপরে দানা দানা মতো র‍্যাশ বেরোতে পারে।

কেন হয় এই সমস্যা

একাধিক কারণ আছে গ্লসাইটিসের পিছনে, জানালেন জেনারেল ফিজিশিয়ান ডাঃ সুবীরকুমার মণ্ডল।

- অতিরিক্ত মানসিক চাপ।
- ডায়াবিটিস।
- ভিটামিন-বি-র অভাব।
- দীর্ঘদিন কোনও রোগী হাসপাতালে থাকলে বা দীর্ঘ সময় ধরে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে।
- কোনও কারণে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে।
- সুপারি-জর্দা দিয়ে পান, গুটখা, সিগারেট ইত্যাদির নেশা থাকলে।
- দাঁতের-সমস্যায়, বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের দাঁত ভেঙে বা ক্ষয়ে গিয়ে ধারালো হয়ে যায়, দাঁত পড়ে যায়। তখন খেতে বা কথা বলতে গিয়ে ধারালো দাঁতে বারবার জিভের আঘাত লাগে, যা ভিজে ক্ষত তৈরি করে। এছাড়া বাঁধানো দাঁত ঠিক মতো সেট না হলে খোলা- পরার সময় বারবার ঘষা লেগে ক্ষতি তৈরি হতে পারে। নিয়মিত ব্রাশ ব্যবহার করলেও এই সমস্যা হতে পারে।
- মুখ খুলে ঘুমোনোর অভ্যেস থাকলে মুখের লালা শুকিয়ে যায়।
- নিয়মিত মুখের ভিতর পরিস্কার না করলেও এই সমস্যা হতে পারে। 'আমরা সকালে ঘুম থেকে ওঠে বা রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সাধারণত ব্রাশ করি। অনেকেই বারবার চা পান করেন কিন্তু মুখ ধোয়ার কথা মাথায় থাকেন না। যতবার চা খাবেন, ততবার মুখ ধোয়া উচিত। এতে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। দাঁত পরিষ্কারের জন্য বহু দিনের পুরনো ব্রাশ ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ ব্রাশের ব্রিসলগুলো শক্ত হয়ে গেলে তার খোঁচায় স্টোমাটাইটিস (মুখের ভিতর ঘা) হয়, যা থেকে পরবর্তীতে জিভ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাড়াহুড়ো করে নয়, সতর্ক হয়ে ব্রাশ করুন,' পরামর্শ দিলেন ডাঃ মণ্ডল।

চিকিৎসা : কিছু খেতে গিয়ে জ্বালা হলে বা জিভের রং পরিবর্তন হলে সজাগ হতে হবে। সমস্যা ফেলে না রেখে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। সাধারণত লক্ষণ দেখেই বুঝে যান চিকিৎসকেরা। কিছু ক্ষেত্রে ক্রনিক সমস্যা হলে ক'টি টেস্ট দিয়ে থাকেন। 'গ্লসাইটিসের মতো স্টোমাটাইটিস-এর কারণ মোটামুটি এক। দুটো সমস্যা একসঙ্গেও হতে পারে। স্টোমাটাইটিসে ঠোঁটের ভিতর বা উলটো দিকে ক্ষত তৈরি হয়। এই দুটো ক্ষেত্রেই মুখের ভিতরে যাতে লালা ঠিক মতো তৈরি হয় এবং মুখের ভিতর পরিষ্কার থাকার উপরে নজর দিতে হয়। কৃত্রিম ভাবে স্যালাইভা তৈরি করার ওষুধ দেওয়া হয়। এবড়োখেবড়ো ধারালো দাঁত থাকলে তুলে ফেলা বা ঘসে মসৃণ করে দেওয়া হয়। দুটো দাঁতের মাঝে দাঁত না থাকলে, সেই স্থানে বারবার জিভ ঘষা লেগে ঘা হলে দাঁত বাঁধিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। ক্লোরেক্সিডাইন সলিউশনে মুখ ধুয়ে ঘুমোতে যাবেন। যন্ত্রণা নিরসনের জন্য অ্যানাস্থেটিক জেল ব্যবহারের হয়তো সামরিক ভাবে ব্যথা অনুভূত হয় না, কিন্তু ব্যথা না থাকায় অসাবধানে খাওয়ার সময়ে বেশি ঘষা লাগে। এতে রোগ সারাতেও সময় লাগে। তাই কেবল অ্যানেস্থেটিক জেল নয়, সমাধানই এক্ষেত্রে কাম্য', বললেন ডাঃ মণ্ডল।

গ্লসাইটিস বা স্টোমাইটিস ইত্যাদি মুখের ভিতরে যে কোনও অসুখই কষ্টদায়ক। তাই সচেতন হওয়া জরুরি। যেমন, কিছু খাওয়ার পরে মুখ ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। খুব গরম বা ঠাণ্ডা খাবার খাবেন না। দাঁত ধারালো হয়ে গেলে বাঁধানো দাঁত পরতে অসুবিধে হলে দ্রুত ডেনটিস্টের পরামর্শ নিন। ডায়াবেটিক হলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা বাঞ্ছনীয়। ধ্যান, যোগাসন করে মানসিক চাপ কমাতে হবে। রক্তে হিমোগ্লোবিন বা শরীরে ভিটামিন বি-এর অভাবে হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ডায়েটের মধ্য দিয়ে তা পূরণ করতে হবে।

গ্লসাইটিস কষ্টদায়ক কিন্তু চিকিৎসা শুরুর পরে দ্রুত আরোগ্য মেলে। কিন্তু বয়স্কদের ক্ষেত্রে ক্রনিক হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

আই.এন.ডি.আই.এ জোটের দলগুলি অভ্যাসে হিন্দুবিরোধী

আসন্ন লোকসভা পর্যন্ত এই জোটে সবাই থাকুক বা নাই থাকুক প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যে হিন্দু সুরক্ষায় বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

বিরোধী জোট। ইন্ডিয়া উচ্চারণ যেন ভুলেও না করি। আই.এন.ডি.আই.এ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স)— কংগ্রেস এবং আরও ২৫টি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল মিলে উঠে পড়ে লেগেছে মোদী বিরোধিতায়। তারা এক পার্টির সাপে নেউলে, তার মধ্যে আবার এসে হাজির ওমর আব্দুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স, পিডিপি-র মেহেবুবা মুফতি, সমাজবাদী পার্টির জাভেদ আলি, শিবসেনার সঞ্জয় রাউত, বিহারের তেজস্বী যাদব, ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন। খুচরো আরও কিছু নাম বাদ পড়ে যাচ্ছে নিশ্চিত। কারণ এমন পাঁচমেশালি ঘ্যাঁট আছে কিন্তু পুরোটাই ছদ্ম। অর্থ খুঁজতে গেলে কিছুই উদ্ঘাটন হবে না। তাই এই I.N.D.I.A-র রাজনৈতিক অর্থ খুঁজব না। এত কলহের মধ্যেও ওদের জোটের একটা তো কমন অ্যাজেন্ডা নিশ্চিতভাবে থাকবে। জোটের সব্বাই খুব নিশ্চিত যে তাঁরা কেউই প্রধানমন্ত্রী হবেন না। তবে? কি এমন কমন ইন্টারেস্ট যা

মোজাইক জোট গঠন রছে, লক্ষ্য ২০২৪ লোকসভায় দেশে সঙ্ঘবদ্ধতা, গণতন্ত্র ফেরানো। এ যে ভূতের মুখে রামনাম! যারা জোট বানাল তাদের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল রাজ্য ভিত্তিক ভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধেই কাদা ছুঁড়ছে। কিন্তু তারা কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসার দিবাস্বপ্নে বিভোর। তারা এমনই জোট যেখানে কংগ্রেস-এনসিপি ঝগড়া, কংগ্রেস বনাম তৃণমূল কংগ্রেস বিবাদ, কংগ্রেস বনাম বাম খণ্ডযুদ্ধ, কংগ্রেস- ডিএমকে, মুখ দেখাদেখি না থাকা কংগ্রেস আর আমআদমি যার কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই, রাজনৈতিক সখ্য নেই। এখনও রাজ্য ভিত্তিক ভাবে একে অন্যের বিরোধী হয়ে যান। যেমন পশ্চিমবঙ্গের বাম-তৃণমূল। বামেরা বিপ্লবী ভাষণে তৃণমূলের আদ্যপ্রান্ত ধোলাই করছে ধর্মতলায়। কিন্তু মুম্বইতে ফিশ কাটলেট ভালোবাসা জেগে উঠছে।

এহেন বিদঘুটে রসায়ন জোটে প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের অবিশ্বাস্য দূরত্ব। এ যেন ফরাসি দার্শনিক গাই ডি-বোরড-এর মোজাইক থিওরি। সবটাই তাদের একজোট করছে? ভারতের হিন্দুত্ব জোরালো হচ্ছে, অন্যদিকে মুসলমান ভোট ব্যাংকটাও আর কোনো রাজনৈতিক দলেরই পৈতৃক সম্পত্তি থাকছে না। তাই কি এখন একটাই উপায় অবিরাম হিন্দু বিরোধিতা করে মুসলমান ভোট ব্যাংক তুষ্ট করা? এই ২৬টি রাজনৈতিক দলের হিন্দুবিরোধিতার সিনড্রোমটি সবার মধ্যেই উপস্থিত। শিবসেনার মধ্যে হিন্দু বিদ্বেষ নেই কিন্তু হিন্দু বিদ্বেষী অপরের মন্তব্যে প্রতিবাদ করল কোথায়। ডিএমকে নেতা স্তালিন পুত্র কিছুদিন

আগে যখন প্রকাশ্য সভায় সনাতন ধর্মকে কদর্য ভাবে আক্রমণ করল, ডেঙ্গি ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যখন সনাতন ধর্মকে তুলনা করছে— তারপর একটাও রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া দেখলাম না।

এই প্রতিক্রিয়াহীনতাই ওই ২৬টি রাজনৈতিক দলের চরিত্র নির্ণয় করল। হিন্দু বিরোধিতা যে ওদের ম্যানিফেস্টোর প্রথম অলিখিত বিন্দু তা বুঝতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। দক্ষিণের স্তালিনে আমাদের অনুসন্ধান থেমে থাকবে না। ওই জোট যে হিন্দুবিরোধী তা পর্যালোচনার জন্য সারা ভারত প্রদক্ষিণ করি। পূর্ব ভারতের অসম, ধুবড়ির সংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল ঘোষণাই করলেন সংখ্যালঘুদের স্বার্থে তাঁর সংখ্যালঘু নির্ভর দল অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট এই জোটকে পূর্ণ সমর্থন করছে। ২৬টি রাজনৈতিক দলই যে স্তালিন পুত্র মন্তব্যের বিরোধিতা করেনি তা নয়। ওরা নিজেরাও বিভিন্ন সময় হিন্দু বিদ্বেষী মন্তব্য পেশ করেছে। তার বিরোধিতা সংশ্লিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে করা হয়নি। আরও মজার কথা কংগ্রেসের হিন্দু বিরোধিতা বামেরা শুনতে পায় না। তৃণমূলেরটা কংগ্রেস জানতে পারে না। অর্থাৎ এই ২৬টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে আর কিছু হোক কিংবা নাই হোক কিন্তু হিন্দু আক্রমণে কেউ টুঁ শব্দ করবে না— এটা বিধি। এই জোটের নিউক্লিয়াস অবশ্যই কংগ্রেস। কংগ্রেসের মুসলমান ভোট ব্যাংক সামলানোর তাগিদ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হলো ২০২২ দিল্লি এম সি ডি নির্বাচনের পরে। যেখানে কংগ্রেসের চূড়ান্ত মন্দ ফলাফলের পর স্পষ্ট যে মুসলমান ভোট আর ওদের Taken for granted নেই!

যার প্রভাব আসল ভারত জোড়ো যাত্রায়। গত ১১ ডিসেম্বর যে যাত্রার পথ ছিল মনকামেশ্বর মন্দির, সরস্বতী ঘাট হয়ে কিদগঞ্জ, কোথপরচা বাহাদুর গঞ্জ এবং প্রয়াগরাজ রেল জংশন। তা আচমকাই রুট ম্যাপে সংযোগ করল মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল অত্তরসুইজা, চাউরাহা, আতালা, খুলদাবাদ এবং নুরুল্লাহা রোড। হিন্দু বিদ্বেষী মন্তব্য কংগ্রেসের কর্ণকুহরে না যাওয়ার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। বিভাজনের রাজনীতি করছে কংগ্রেস। তাই মধ্যপ্রদেশের অন্য ফর্মুলা। সেখানে কমলনাথ হিন্দু ভোট ধরতে মেকি হিন্দুত্বের মোড়কে মন্দিরে বৈঠক করছেন, জমায়েত করছেন কিন্তু দেশের যে প্রান্তেই হিন্দু ধর্মে আঘাত আসুক না কেন উনি প্রতিক্রিয়া করেন না। বেশ অন্যরকম ফলাফল দেখা গেল ২০২৩-এর কর্ণাটক নির্বাচনেও। কংগ্রেসের জয় আসলো বটে, তবে তার সঙ্গে ঘটল অপ্রত্যাশিত ঘটনা। পুরাতন মাইসুরুতে মুসলমান ভোটে (জনসংখ্যার ১১ শতাংশ মুসলমান) ভর করে যে জনতা দল (সেক্যুলার) জয় পেত তা কনসোলিডেটেড হয়ে চলে গেল কংগ্রেসের ঘরে। যা কংগ্রেসকে আরও একটু বেশি হিন্দু বিরোধী করল। মুসলমান ভোট ব্যাংক এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তে যে কোনো বেফাঁস বেহুঁশ রাজনৈতিক মন্তব্য করছে কংগ্রেস।

এই তো ক'দিন আগেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আসন্ন তেলেঙ্গানা নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনায় কে সি বেণুগোপালের মন্তব্য ছিল--- তেলেঙ্গানার কে.সি.আর মুসলমান ভোটের লোভেই লোকদেখানি বিজেপি বিরোধিতা করে। যদি এই তত্ত্ব ঠিক ধরে নিই,তবে তো সহজেই উলটো তত্ত্বটিও ঠিক— কংগ্রেসও মুসলমান ভোটের লোভেই সনাতন বিদ্বেষের বিরোধিতা করে না। আসল কথা, কংগ্রেসের এই মুহূর্তে লক্ষ্য বিজেপির প্রতিস্থাপক রূপে নিজেকে প্রদর্শন করা। তাই উত্তরপ্রদেশে ওরা এসপি এবং বিএসপি-কেও সমর্থন করতে নারাজ। এর থেকে স্পষ্ট মুসলমান ভোট ব্যাংক নিয়ে বাঁদরের পিঠে ভাগ চলছে ২৬টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে। জোটের স্বার্থে না, নিজের নিজের গদির স্বার্থে তাই হিন্দু বিরোধিতা একান্ত দরকার। যে কর্ণাটক নির্বাচনের প্রসঙ্গে আগেও উল্লেখ করলাম। তার রাজনৈতিক আদব কায়দা বলে দেবে হিন্দু বিরোধিতার মাত্রা। ২ মে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারে উল্লেখ ছিল বজরঙ্গ দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। এখনই হয়তো মল্লিকার্জুন খাড়গে-সহ কংগ্রেস রে রে করে বলবে। কেন?

পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়াকেও তো নিষিদ্ধ করার কথা উল্লেখ ছিল। এসবই ভাঁওতা। পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া তার ঢের আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের এবং ইন্টেলিজেন্সের কাছে প্রমাণযোগে একটি টেরর সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার দেশ বিরোধী কার্যক্রম বিষয়ে যখন কেন্দ্র মাথা ঘামাচ্ছে; তখন তো দেশের স্বার্থে কংগ্রেস বা ২৬ দলের একটি দলও এগিয়ে আসেনি। সহযোগিতা করেনি। যখন হাতেনাতে প্রমাণ-সহ প্রতিষ্ঠিত হলো পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া একটি দেশ বিরোধী ইসলামিক অর্গানাইজেশন। ঠিক তারপরেই নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে কংগ্রেস তা নিষিদ্ধকরণের প্রসঙ্গ যোগ করল। তাই কংগ্রেসের ওই যোগ একটা আই ওয়াশ। মূল উদ্দেশ্য বজরঙ্গ দলের ওপর নিষিদ্ধতা আরোপ। এবং ওই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে মুসলমানদের অতিরিক্ত ৪ শতাংশ ওবিসি কোটায় সংরক্ষণের কথাও উল্লেখ ছিল। তাই খুব স্পষ্ট কোনো তুষ্টিকরণের তাড়নায় বজরঙ্গ দল নিষিদ্ধ করতে হয়। এই কংগ্রেস কিন্তু ১৯৮০-র মোরারাবাদ রায়টের দোষীদের শাস্তি দিতে পারেনি। এক ব্যক্তির কমিশন সেদিন সরকারি আধিকারিক জেলাশাসক এসপি আর্য এবং স্পেশাল সুপারিটেনডেন্ট অব পুলিশ ভিএনসিংহ-কে ক্লিনচিট দিয়ে মুসলমান ভোট ব্যাংক সামলেছিল। সেই রাজনৈতিক দল যখন বজরঙ্গ দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণার কথা বলে তাতে খুব বিস্মিত হই না। বরং হিন্দু বিদ্বেষের রূপ বারবার প্রমাণ পায়।

কেরালায় সিপিআইএম এক দেশ এক আইন নিয়েও হিন্দু মুসলমান কার্ড খেলেছে। উদ্দেশ্য এক কথায় মুসলমান ভোট বাঁচান। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন দাবি রাখেন যারা অ্যান্টি সিএএ-বিক্ষোভে সামিল ছিল; তাদের বিরুদ্ধে জমা হওয়া সব অভিযোগ খারিজ করতে হবে। অর্থাৎ আবারও সংখ্যালঘু তোষণ। বিজয়নের এই মন্তব্যে সমর্থন জানান আই-ইউ-এম-এল। যাদের পাশে দু' হাত তুলে সমর্থন করছিল মুসলিম লিগ। যে রাজনৈতিক দল, রাজ্য মুসলিম লিগের অনুপ্রেরণায় সিএএ বিরোধী হয় তারা যে হিন্দু স্বার্থ বিরোধী হবে তাতো খুব সহজ অঙ্ক। কেরলার মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যেই হালাল সমর্থন করেন। যা নিয়ে কেরালাবাসীদেরই বড়ো অংশের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। তাই এই সকল রাজনীতিকরা আসলে হিন্দুত্ব বিরোধী জোট করছেন। হিন্দুর সুরক্ষা তাদের কাছে তাই সাম্প্রদায়িক ঠেকে। যে বামেরা নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি

করে তারাই কেরালা জাম-ইয়াতউল-উলেমার সভাপতি জাফরি থাংগলকে পাশে ডাকে এক দেশ এক আইনের বিরুদ্ধাচার করে। তারাই মুসলিম লিগকে সেক্যুলার হিসেবে চিহ্নিত করে।

তাই লাভ জিহাদের প্রসঙ্গ উঠলেই বলে ওঠে— ওসব ফেক। অতি রঞ্জিত। তাই যখন কংগ্রেসের ভূপেন বরহা মন্তব্য করেন— মহাভারতের যুগেও লাভ জিহাদ ছিল! তখন সেই কটূ মন্তব্যে জোটের ২৬-এর কেউ টুঁ শব্দ করে না। মিডিয়ার সামনে কংগ্রেস নেতা বলেন— শ্রীকৃষ্ণ যখন রুক্মিনী-কে বিবাহ করতে আগ্রহী হন তখন অর্জুন নারীর ছদ্মবেশে উপস্থিত। এটাই বুঝি ছিল লাভ জিহাদ! মহাভারতের বিকৃত ব্যাখ্যায় ভারতীয়ত্বকে অসম্মান এবং একই সঙ্গে আজকের ঘৃণ্য লাভ জিহাদকে হালকা করে প্রদর্শন করার অপকৌশল চলছে। ক্ষমা চায়নি মুসলমান তুষ্টিতে ব্যস্ত সেই রাজনৈতিক দল এবং নেতা। হরিয়ানার মেওয়াটে সদ্য ঘটা হিন্দু বিরোধী হিংসায় মদতদাতাও যে কংগ্রেস বিধায়ক মাম্মন খান। তাই বারবার শত সহস্রবার প্রমাণিত ২৬ দলের জোটের সাম্প্রদায়িক ভঙ্গিমা কতটা হিন্দুবিরোধী। রাহুল গান্ধীও ২০১৮-১৯ নাগাদ বলেছিলেন আমি সফট বা হার্ড কোনো হিন্দুত্বতেই বিশ্বাস করি না। তাই ভোটের জন্য যখন মাঝে মাঝে হিন্দুত্বর মোড়কে চাপান তাতে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অজ্ঞতা প্রমাণ পেয়েছে। হিন্দু বিদ্বেষ কংগ্রেস এবং তার থেকে জন্ম নেওয়া সব আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের মধ্যেই বর্তমান।

বীর সাভারকার যা একদিন সতর্ক করেছিলেন, 'Even if there is no apparent threat to Hindu Rashtra at presnt, Hindu society needs to be vigilant regarding the rise of this type of Buddhism that is against Hindu Dharma'— নিও আম্বেদকারিজমে অতি বিশ্বাসীদের অধিকাংশই বর্তমানে হিন্দুবিদ্বেষী। অন্তত হিন্দু সুরক্ষাকে তো অগ্রাহ্য করেই। এই ২৬ দলের সবাই যদি মুসলমান তোষণ নাও করে, কিন্তু নিও-আম্বেদকারিজমের অতি ভক্তি যারা হিন্দু স্বার্থ, সুরক্ষা ভাবতে নারাজ। তাই কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতা সতীশ জারকিহলি যখন উদ্ধত ভঙ্গিতে বলেন হিন্দু একটা Vulgar শব্দ, শিবরাজ চৌহান যখন ভগবত গীতার সঙ্গে কোরানের তুলনা করেন তখনও তা ওই ২৬ দলের সবাই সহজ ভাবে নেয়। কর্ণাটকে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতেই ক্যাবিনেটে Anti Conversion law-কে খারিজ করতে আদাজল খেয়ে উদ্যোগ নেয়। যা সম্পূর্ণ হিন্দুবিরোধী। ছত্তিশগড়ের কংগ্রেসের মেয়র হেমা দেশমুখ স্বয়ং গণ ধর্মান্তরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। যেখানে হিন্দুদের বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এরপরেও কি ২৬ দলের কোনো নেতা কি হিন্দুবিরোধী মন্তব্য করছেন বা পদক্ষেপ নিচ্ছেন তাতে অতিরিক্ত বিস্মিত হব!

যাদের জোটে এখনও বোঝাই যাচ্ছে না নীতিশ কুমারের অবস্থান। এখনও একটা প্রতীক তৈরি হয়নি। কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডাই নেই যাদের। তাদের জোট একটা হাস্যকর বিষয়।

কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের মন্তব্য— good Hindu রামমন্দিরে যাবে না এবং অগণিত মন্তব্য যা বিকৃত-হিন্দুবিদ্বেষী। কংগ্রেস এবং কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া এমনকী মৌখিক নিন্দাটুকুও শোনা যায়নি।

কমরেড বৃন্দা কারাত এক লম্ফে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন— তিনি বুঝি কিছু হিন্দু সংগঠনে হেট স্পিচ শুনছেন। শশী থারুর কিংবা পিনারাই বিজয়ন বা ২৬ দলের যত হিন্দুবিদ্বেষী মন্তব্য বার্তা এসেছে তখন বোধহয় উনি বধিরতা পালন করেন। আরও এক কমরেড সুভাষিণী আলি স্মার্ট ভাবে বলতে পারেন Rapists are Sanskari (সংস্কারি)! প্রতিবাদ হয় না কারণ ২৬ দলের কারোর কর্ণকুহরে পৌঁছায় না। এমন অসংখ্য উদাহরণে আর ভার বৃদ্ধি করছি না। ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে অদ্ভুত অসংখ্য ঘটনা ঘটে। তাই লালু প্রসাদ যাদব মুসলমান ভক্ত নেতা আবার বিজেপি যাকে উচ্চ বর্ণের রাজনৈতিক দল বলে চিহ্নিত করা হতো সেখানে দলিত ভোট কনসোলিডেটেড হয়।

মায়াবতী দলিত নেত্রী হয়েও শূন্য ঝুলিতে ফেরেন। নীতি কৌশল দলের সম্পদ হতে পারে কিন্তু ভোটার সম্পত্তি নয়। নয় বলেই উত্তরপ্রদেশের নগর পঞ্চায়েতে বিজেপির টিকিটে এবছর ৬১ জন মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত। পসমন্দা মুসলমান ক্রমশ বিজেপি মুখী। বা বলা উচিত কংগ্রেস-সমাজবাদী পার্টির বাঁধা মুসলমান ভোটারও তাদের হাত ছাড়ছে। যা ২৬ দলের সবার মাথা ব্যথা বৈকি। এতদিন ছিল মুসলমান তুষ্টির প্রতিযোগিতা এখন তার সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রকাশ্যে হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে কটূ মন্তব্য, বিকৃত ব্যাখ্যা, হিন্দু বিদ্বেষী তত্ত্ব ভাষণ। আমাদের দেশে Blasphemy আইন সক্রিয় নয়। তাই যত তাচ্ছিল্য হিন্দু ধর্মকে নিয়েই করা যায়। ইসলাম নিয়েও করা যায় কিন্তু তাতে পান থেকে চুন খসলে তা হবে 'না-ইনসাফি'। তা হবে ইসলামোফোবিয়া। তা হবে অসহিষ্ণুতা। এবং কালো পতাকা উড়বে ওই ২৬ রাজনৈতিক দলের মাথায়। ওই ২৬ রাজনৈতিক দলের জোট করার কি প্রয়োজন ছিল? যাদের জোটে এখনও বোঝাই যাচ্ছে না নীতিশ কুমারের অবস্থান। এখনও একটা প্রতীক তৈরি হয়নি। কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডাই নেই যাদের। তাদের জোট একটা হাস্যকর বিষয়। হিন্দু বিরোধিতার জন্য কি আর জোটবদ্ধ হতে হয়? সব হিন্দুবিরোধী স্বাভাবিক ভাবেই জোটবদ্ধ। সংখ্যালঘুদের তুষ্টিকরণ ব্যাকুলতায় সবাই ভুগছে। তুষ্টির মঞ্চে ওরা সবাই অলিখিত ভাবে আগেও জোটবদ্ধ ছিল। I.N.D.I.A জোটে যে অসংখ্য ফাটল এবং তা যে ক্রমশ প্রকাশ্য সে ধারণা করাই যায়। আসন্ন লোকসভা পর্যন্ত এই জোটে সবাই থাকুক বা নাই থাকুক প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যে হিন্দু সুরক্ষায় বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ■

হিন্দুরা আর সনাতন ধর্মের অপমান সহ্য করবে না

মণীন্দ্রনাথ সাহা

আবারও আক্রান্ত সনাতন ধর্ম। এবারে আক্রান্ত দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্য। আক্রমণ করেছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্ট্যালিনের পুত্র উদয়নিধি স্ট্যালিন। উদয়ানিধি স্ট্যালিন বলেছেন—কিছু জিনিসের প্রতিবাদ করা যায় না। সেগুলির অবলুপ্তি ঘটানো দরকার। আমরা ডেঙ্গু, মশা, ম্যালেরিয়া কিংবা করোনার বিরোধিতা করি না। আমরা সেটা নির্মূল করি। ঠিক সেভাবেই আমাদের সনাতন ধর্মকে অবলুপ্ত করতে হবে। 'সনাতন' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত থেকে। এটা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের বিরুদ্ধে।' উদয়ানিধির এমন বক্তব্যের পরেই বিতর্ক দেখা দেয়। তাঁকে সমর্থন জানান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ছেলে প্রিয়ঙ্ক খাড়গে। এই ইস্যুতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং শিবসেনা দলের নেতা উদ্ধব ঠাকরে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথারীতি উদয়ানিধির বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন; তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন উদ্ধব ঠাকরে। কেননা তাঁর বাবার বালাসাহেব ঠাকরে ছিলেন হিন্দু হৃদয় সম্রাট। কিন্তু উদ্ধব তাঁর বাবার আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে হিন্দুর শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপি বিরোধিতায় নেমেছেন। এখন তিনি না পারছেন উদয়ানিধির বিরুদ্ধে কিছু বলতে, না পারছেন উদয়ানিধির কথা হজম করতে।

উদয়নিধি

এই বক্তব্যের পরেই দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পাশাপাশি বিজেপির সর্বস্তরের নেতৃত্ব উদয়ানিধির বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিষয়টি ভালোভাবে নেননি। তিনি মন্ত্রীদের বলেছেন, সনাতন ধর্ম নিয়ে উদয়ানিধির বক্তব্যের যথাযথ প্রতিক্রিয়া দিতে হবে। স্ট্যালিন পুত্র উদয়ানিধির বক্তব্যের যথাযথ প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শিরচ্ছেদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অযোধ্যার সন্ন্যাসী।

এত কিছুর পরেও নিজের বক্তব্য থেকে দূরে সরতে রাজি নন উদয়নিধি। তিনি তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করছেন না। সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা এবারেই প্রথম হলো না। এর আগেও কংগ্রেস এবং ডিএমকে-র অন্য সহযোগীরা সনাতন ধর্মের ওপর আরও অশোভন ভাষায় আক্রমণ করেছে এবং এখনও করে। এবারে দ্রাবিড়বাদের প্রতীক ব্যবহার করে মার্কসবাদী-মিশনারি যোগসাজসে এই ঘোষণা।

হিন্দুদের এবার ভাববার সময় এসেছে। সেই মুঘল- পাঠানদের আমল থেকে শুরু করে ইংরেজদের হাতে এদেশের অগণিত হিন্দু আক্রান্ত, অত্যাচারিত, ধর্মান্তরিত, নিহত হওয়ার পর এবং দেশভাগের পর মনে হয়েছিল, এবার বোধহয় হিন্দুরা দেশে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু তা হলো না। এখন দেশের ভেতরের এবং বাইরের শত্রুরা হিন্দুদের নিকেশ করার পরিকল্পনা করেছে। নতুন করে জোট বেঁধে নেমে পড়েছে। কাজেই হিন্দুদের একমত হয়ে শত্রুদের পরাজিত করে হিন্দুদের শান্তিতে বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

আর কয়েকমাস পরে লোকসভার ভোট। গত প্রায় দশ বছর ধরে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের আর্থিক, সামরিক ও সামাজিক বিষয়ে যেভাবে দেশকে নিয়ে চলেছেন তাতে বিরোধী দলগুলোর নাভিঃশ্বাস উঠেছে। দেশের মানুষও এখন এক ডাকে নরেন্দ্র মোদী ছাড়া আর কারও হাতে দেশের দায়িত্ব দিতে চায় না। এমতাবস্থায় দেশে যত বিজেপি বিরোধী দল আছে তাদের মধ্যে নীতি-আদর্শের কোনো মিল না থাকলেও রাজনীতির আঙিনায় টিকে থাকার জন্য সবাই মিলেমিশে মোদীকে সরানোর চেষ্টায় নেমেছে। এই দলগুলোর মধ্যে দুটি প্রাচীন জাতীয় দল, একটি নব্য জাতীয় দলের তকমা পাওয়া এবং আর সব আঞ্চলিক দল। কারও নীতির সঙ্গে কারও নীতির মিল নেই। এদের প্রত্যেকেই দেশের চেয়ে পরিবারের প্রতি বেশি দরদ। কাজেই এদের পারিবারিক দলও বলা যায়। দু' একজন ছাড়া প্রত্যেকেই বাবার আশীর্বাদে ক্ষমতায় বসেছে এবং এখন তারাই আবার তাদের পুত্রকে বা ভাইপোকে ক্ষমতার শীর্ষে তুলে ধরার জন্য ব্যস্ত। আর এ কারণেই এরা জোট বেঁধেছে নরেন্দ্র মোদীকে হারাতে। এরকম এক সময়ে স্ট্যালিন পুত্র উদয়ানিধি এক বেফাঁস মন্তব্য করে বসলেন। কেন তিনি এরকম মন্তব্য করলেন? এর উত্তরে একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

সে অনেকদিন আগেকার অর্থাৎ গত শতাব্দীর ষাটের দশকের কথা। পাকিস্তানে আয়ুব খানের আমলের ঘটনা। মৌলিক গণতন্ত্রের (Basic democracy-র) যুগ। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন। কোনো এক নির্বাচনী কেন্দ্রে জব্বর আলি মুন্সী নামে একজন জবরদস্ত প্রার্থী দাঁড়িয়েছে। মুসলমানরা তাকে ভালোবাসে, হিন্দুরা তাকে ভয় করে। কারণ বলাই বাহুল্য। তার নামডাক আছে। তার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতেই সাহস করে না। হঠাৎ কালু মিয়া নামে এক অতি সাধারণ ব্যক্তি কোমর বেঁধে মাঠে নামল। সে জব্বর মুন্সীর বিরুদ্ধে লড়বে। সবাই বলল— কালু, তুই ভোটে দাঁড়িয়ে কী করবি। তোকে কে চেনে? তুই এমন কী কাজ করেছিস যে লোকে তোকে এক ডাকে চিনবে?

কালু মনে মনে ভাবল, এই কথা। আইচ্ছা, আমি এমন কাম করুম যাতে লোকে আমাকে এক ডাকে চেনে। সে তখুনি ছুটে বাড়ি গিয়ে 'তিন তালাক' বলে সে তার সাদি করা স্ত্রীকে তালাক দিল। আর তার পরেই বিধবা শাশুড়িকে সাঙা করে বসল। চারিদিকে হইচই পড়ে গেল। কালু মিয়া রাতারাতি পরিচিত হয়ে পড়ল। কালু মিয়া যখন ভোটে দাঁড়াল, তখন লোকে জিজ্ঞাসা করে এই কালু মিয়া কে? তার উত্তরে লোকে বলে— ওই সে, বউকে তালাক দিয়ে শাশুড়িকে সাঙা করেছে যে, সেই কালু মিয়া।

বিরোধীরা ২৬ দলের জোট বাঁধার পর থেকে কেউ নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে, কেউ বিজেপির বিরুদ্ধে, কেউ হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তব্য রাখছেন। সেই ধারা বজায় রেখেই অখ্যাত উদয়ানিধি বিখ্যাত হওয়ার জন্য সনাতন ধর্মকেই দেগে দিলেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই দেশজুড়ে বিতর্ক তৈরি করে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এও এক কালু মিয়া।

আই.এন.ডি.আই.এ. জোট দেশের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে অসম্মান করছে

সুব্রত মণ্ডল

'I.N.D.I.A.' বা বিরোধী জোট— এই নামের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে ইন্ডিয়া বনাম প্রাচীন ভারতের সনাতন ধর্মের বিরোধাভাস। পুরাণে 'দক্ষিণে সমুদ্র এবং উত্তরে তুষার আবাস'-এর মধ্যবর্তী জায়গাকে ভারত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকের মতে, কিংবদন্তী রাজা ভরতের নাম থেকে 'ভারত' শব্দটির আবির্ভাব ঘটেছে। পুরাণ অনুযায়ী, ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের একটি অংশ ছিল। জম্বুদ্বীপ হলো পৃথিবীর সাত দ্বীপ বা মহাদেশের একটি দ্বীপ। ভারত কোনও ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সত্তা নয়। এটি আসলে ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্তা। ১৯২৭ সালের জানুয়ারিতে, জওহরলাল নেহরু লিখেছিলেন, 'ভারতে একাত্মতার মূল হলো এক সাধারণ বিশ্বাস ও সংস্কৃতি। প্রাচীনকাল থেকে এখানে একত্মতা রয়েছে।' ভারত হিন্দুদের পবিত্র ভূমি।

ইন্ডিয়া হলো ২৫০-৩০০ বছরের ইতিহাস আর ভারত নামের সঙ্গে জড়িয়ে ৫ হাজার বছরেরও বেশি ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক রাজনীতিক সত্তা। তাই এই জোটের বিভিন্ন দলের নেতাদের মুখে হিন্দু ও হিন্দুত্ব বিরোধী বিভিন্ন কটূক্তি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ হামেশাই শোনা যায়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক এক করা এবং জাতপাতের নামে হিন্দু ধর্মকে বিভাজিত করা।

চেন্নাইয়ে একটি অনুষ্ঠানে উদয়নিধি স্ট্যালিন বলেন, 'কয়েকটি বিষয়ের বিরোধিতা করা যায় না। সেগুলি শুধুমাত্র ধ্বংস করে ফেলতে হয়। আমরা ডেঙ্গি, মশা, ম্যালেরিয়া বা করোনার বিরোধিতা করতে পারি না। আমাদের সেগুলিকে ধ্বংস করে দিতে হবে। ঠিক সেভাবেই আমাদের সনাতনকে নির্মূল করতে হবে।'

এই ভাবেই সনাতন ধর্মকে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গির সঙ্গে তুলনা করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়নিধি স্ট্যালিন। প্রসঙ্গত ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে রয়েছে স্ট্যালিনের পার্টি ডিএমকে। এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ইন্ডিয়া জোটকেই নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজস্থানে ভোট প্রচারে গিয়ে তিনি বললেন, বিরোধী জোট আসলে 'হিন্দুত্বকে ঘৃণা' করে। রাজস্থানের দুঙ্গারপুরে একটি সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বিরোধী জোটের

স্বামীপ্রসাদ মৌর্য

উদ্ধব ঠাকরে

উদ্দেশে অমিত শাহ বলেন, 'আপনারা কীসের মূল্যে ক্ষমতা চান? আপনারা সনাতন ধর্ম এই দেশের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে অসম্মান করছেন।' তাই উদয়নিধির মন্তব্যকে ধরেই অমিত শাহ তাঁর বক্তব্যে ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করেছেন।

হিন্দু সংগঠনগুলিকে সন্ত্রাসী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে তুলনা করার জন্য শাহ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকেও নিশানা করেন। কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'কোন ধর্ম কি খুন বা সহিংসতাকে উৎসাহিত করে? কিন্তু মনুবাদ ও হিন্দুত্ব খুন, হিংসা ও বৈষম্যকে উৎসাহিত করে।' উত্তরপ্রদেশের বেরিলিতে মহরমের সময় দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদের পর ভাইরাল হচ্ছে সমাজবাদী পার্টির নেতা বীরপাল সিংহ যাদবের একটি ভিডিয়ো। ভিডিয়োতে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বীরপাল সিংহ যাদবকে বিতর্কিত বক্তব্য দিতে দেখা যাচ্ছে। এই ভিডিয়োতে, বীরপাল উমরিয়া গ্রামের মুসলমান পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, যাদেরকে মহরম ও কানওয়ার যাত্রায় শ্রাবণ মাসে ভক্তরা বাঁক নিয়ে শিবের থানে জল ঢালতে যায়।

এখানে বীরপাল বলেছেন যে তিনি সবসময় কানওয়ার যাত্রার বিরুদ্ধে ছিলেন। কেননা কানওয়ার যাত্রায় বেশিরভাগ মানুষ মদ ও গাঁজা সেবন করে। মদ ও গাঁজা সেবন করে তারাই হাঙ্গামা করেছিল, এখন শুধু রামের সঙ্গে নয়, শঙ্করের সঙ্গেও লড়াই করতে হবে সমাজবাদী পার্টিকে। কুশীনগর থেকে সমাজবাদী পার্টির পূর্ব সাংসদ বালেশ্বর যাদব এক প্রেস বার্তায় মন্তব্য করেছেন যে, হিন্দু শব্দ হলো একটি ফার্সি শব্দ যার অর্থ কালা, চোর, কাফির, লুটেরা। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি (এসপি) নেতা স্বামীপ্রসাদ

ফঃ ৪

পশ্চিমবঙ্গের ওবিসি আইনে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জী সরকার ওবিসি-এ আইন পাশ করে ২০১২ সালে। মমতা ব্যানার্জী বিধানসভায় ওবিসি-এ আইন পাশ করায় যার নাম হলো— ওয়েস্টবেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস রিজার্ভেশান অব ভ্যাকেন্সি ইন সার্ভিসেস অ্যান্ড পোস্ট আইন--- ২০১২। এই আইনের উদ্দেশ্য হলো, হিন্দু ওবিসিদের বঞ্চিত করে তাদের ভাগের কোটা মুসলমান সম্প্রদায়কে পাইয়ে দেওয়ার। উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও তোষণমূলক ধান্দাবাজির কারণে, কোনো সঠিক সার্ভে না করে এই আইনটি পাশ করানো হয়। সেই অনুযায়ী ওবিসি-এ-তে ৮১টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ৭৩টি মুসলমান সম্প্রদায় এবং ওবিসি-বি-তে ৯৯টি সম্প্রদায়ের মধ্যে ৪৬টি মুসলমান সম্প্রদায় মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ১৫০টি হিন্দু সম্প্রদায়কে ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়েছিল। সংরক্ষণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে একটা বড়ো অংশের হিন্দু অনগ্রসর জাতি। অথচ পশ্চিমবঙ্গে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশে ১২টি মুসলমান সম্প্রদায়ের নাম ছিল, একে অনৈতিক ভাবে বাড়িয়ে ১১৯ করা হয়েছে। ১৭ শতাংশ সংরক্ষণের মধ্যে ১০ শতাংশ মুসলমান বহুল ওবিসি-এ, ৭ শতাংশ হিন্দু বহুল ওবিসি-বি-কে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রচারে মমতা নিজেকে ঋকবেদের বিরাট পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে তাঁর একটি হাত হিন্দু, অন্য হাতটি মুসলমান। একটি পা মতুয়া, অন্য পাটি হলো— রাজবংশী।

মৌর্য হিন্দুধর্ম নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে হিন্দু কোনো ধর্ম নয় কিন্তু ফার্সি ভাষায় এর অর্থ চোর এবং ঘৃণ্য। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন, যারা হিন্দু জাতি দাবি করছে তারা দেশদ্রোহী। ভারত কখনো হিন্দু জাতি ছিল না, হবেও না। হিন্দু ধর্ম কোনো ধর্ম নয়।

মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্ঘাটনের পরে গোধরার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তির কথা বলেছেন। জলগাঁওয়ের একটি অনুষ্ঠানে উদ্ধব ঠাকরে একটি সম্ভাব্যতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে 'সারা দেশ থেকে অনেক হিন্দুকে বাস এবং ট্রেনে অযোধ্যায় আনা হবে। সেখান থেকে ফেরার সময় পথে কোথাও একটি গোধরার মতো ঘটনা ঘটানো হতে পারে' বলে হুমকিও দিয়েছেন।

কংগ্রেসের হিন্দু বিরোধিতা :

(১) ২৬/১১-এর পিছনে হিন্দু : মুম্বই হামলার পরে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দিগ্বিজয় সিংহের পিছনে হিন্দু সংগঠনগুলির ষড়যন্ত্রের দাবি করেছিলেন। দিগ্বিজয়ের এই বিবৃতিটি পাকিস্তান ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল এবং আজও যখনই এই হামলার কথা বলা হয়, পাকিস্তান সরকার দিগ্বিজয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করে যে এই হামলার পিছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ রয়েছে। কংগ্রেস কখনোই কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বা দিগ্বিজয়ের এই বক্তব্যকে অস্বীকারও করেনি। এছাড়াও তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্ডে এবং পি চিদাম্বরম হিন্দু সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন এবং আমেরিকান কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া ডসিয়ারে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল।

(২) মন্দিরে যাতায়াতকারীরা উত্যক্ত করে : রাহুল গান্ধী বলেছিলেন যে লোকেরা মন্দিরে যায়, তারা বাসে ও পাবলিক প্লেসে মেয়েদের উত্যক্ত করে। তার এই বক্তব্য কংগ্রেস ও তার শীর্ষ নেতৃত্বের হিন্দুবিরোধী চিন্তাধারার পরিচায়ক ছিল।

(৩) রাম সেতুতে হলফনামা : ২০০৭ সালে, কংগ্রেস সরকার সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামা দিয়ে বলেছিল, যেহেতু রাম, সীতা, হনুমান এবং বাল্মীকি ইত্যাদি কাল্পনিক চরিত্র, তাই রাম সেতুর কোনো ধর্মীয় গুরুত্ব আছে বলে মনে করা যায় না। বিজেপি যখন এই ইস্যুটি জোরালোভাবে উত্থাপন করেছিল তখনই মনমোহন সরকারকে পিছিয়ে যেতে হয়েছিল। যদিও পরবর্তী সময়েও কংগ্রেস রাম সেতু ভেঙে দেওয়ার পক্ষে ছিল বলে মনে হয়েছিল।

(৪) হিন্দু সন্ত্রাস শব্দটির প্রয়োগ : এর আগে কখনও হিন্দু শব্দের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। মালেগাঁও এবং সমঝোতা ট্রেন বিস্ফোরণের পরে কংগ্রেস সরকারগুলি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে হিন্দু সংগঠনগুলিকে বিস্ফোরণে জড়িত করেছিল এবং প্রকাশ করেছিল যে দেশে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের হুমকি বাড়ছে। এত বছর কারাগারে থাকার পর এই মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া নিরপরাধীরা নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে।

(৫) ইসলামিক তিন তালাকের সঙ্গে রামের তুলনা : তিন তালাক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানির সময়, কপিল সিবাল এটিকে সীতার বনবাস পর্বের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এটা নিশ্চিত যে কপিল সিবাল এটা অজান্তে বলেননি, খুব ভেবেচিন্তে

বলেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ভগবান শ্রীরামকে নিয়ে ঠাট্টা করা। আদালতে এই যুক্তি দিয়ে কংগ্রেস মুসলমানদের খুশি করার চেষ্টা করেছে।

(৬) বন্দেমাতরম্ : স্বাধীনতার পরে, বন্দেমাতরম জাতীয় সংগীত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মনে করা হয় যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এর বিরোধিতা করেছিলেন, বলেছিলেন যে এটি মুসলমানদের হৃদয়ে আঘাত করবে। ব্রিটিশরা দেশে তুষ্টির রাজনীতি শুরু করেছিল, নেহরু তা বন্ধ করেননি। ফলে অনেক জায়গায় বন্দেমাতরমকে অপমান করার চেষ্টা হয়। যেখানেই এটি গাওয়া হয়, মৌলবাদী মুসলমানরা তা বয়কট করে।

(৭) সোমনাথ মন্দিরের বিরোধিতা : হিন্দুদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্দির সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস বলেছিল যে সরকারি কোষাগারের টাকা মন্দির নির্মাণে ব্যবহার করা উচিত নয়, যেখানে এই সময়ের মধ্যে হিন্দু মন্দিরগুলিতে বিপুল পরিমাণ অনুদান সরকারি কোষাগারে জমা হতে শুরু করেছে। একই সময়ে বাবরি, কাশী বিশ্বনাথ এবং মথুরা কৃষ্ণ জন্মভূমির বিরোধেরও সমাধান হতে পারতো কিন্তু কংগ্রেস তা হতে দেয়নি।

(৮) বিএইচইউতে হিন্দু শব্দ নিয়ে আপত্তি : বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু শব্দটি নিয়ে কংগ্রেসের তৎকালীন সিনিয়র নেতাদের আপত্তি ছিল। এর জন্য তারা মদনমোহন মালব্যের ওপর চাপও দিয়েছিলেন। কিন্তু আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণে তাদের কোনো আপত্তি ছিল না।

(৯) হজের জন্য ভর্তুকি : কংগ্রেস সরকারই হজে যাওয়া মুসলমানদের ভর্তুকি দেওয়া শুরু করেছিল। এমন ভর্তুকি বিশ্বের অন্য কোনও দেশে দেওয়া হয় না, যেখানে কংগ্রেস সরকার অমরনাথ যাত্রায় বিশেষ কর আরোপ করেছে। এছাড়া হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মীয় তীর্থস্থানের অবকাঠামোও গড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। এখন মোদী সরকার আসার পর উত্তরাখণ্ডের চার ধামকে যুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। কংগ্রেস মুসলমানদের খুশি করার জন্য শাহবানো মামলায় আইন পাশ করে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত বাতিল করেছিল, যেখানে কংগ্রেস হিন্দুদের খুশি করার জন্য এমন কিছু করেনি।

(১০) ৯০ শতাংশ মুসলমানদের ভোট দেওয়া উচিত : সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি কমলনাথ বলেছিলেন যে ৯০ শতাংশ মুসলমান ভোট না দিলে কংগ্রেসের জয়লাভ কঠিন হবে। খোদ মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের ইস্তেহারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখাগুলি বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। তাই অবিলম্বে সমগ্র হিন্দু সমাজ জাতপাত ভেদাভেদ ভুলে যদি একত্রিত হয়ে সনাতন ধর্ম এই দেশের সংস্কৃতি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে পরাস্ত করতে না পারে, আগামী দিনে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দু যে ভাবে বেঁচে আছে, ভারতের হিন্দুদের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ হবে। তাই সময় থাকতে সাবধান।

সনাতন ধর্ম একটি জীবন দর্শন : সুপ্রিম কোর্ট

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের তত্ত্বকে মান্যতা দিয়ে ১৯৬৬ সালে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি গজেন্দ্রগড়কর তাঁর একটি রায়ে 'হিন্দুত্বের' সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা অসম্ভব বলে উল্লেখ করেন। ১৯৯৪ সালে অযোধ্যা ও সন্নিহিত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় আইন মোতাবেক জমি অধিগ্রহণকে চ্যালেঞ্জ করে ইসমাইল ফারুকির দায়ের করা মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে 'হিন্দুত্ব' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করে। তিন সদস্যের বেঞ্চের অন্যতম বিচারপতি এসপি ভারুচা তাঁর রায়ে উল্লেখ করেন যে হিন্দুত্ব একটি জীবন পদ্ধতি এবং একটি মানসিক পর্যায়। 'হিন্দুত্ব' শব্দের অর্থ কোনো ভাবেই হিন্দু ধর্মীয় মৌলবাদ নয়। বিচারপতি ভার্মা তাঁর রায়ে অতীতের একাধিক সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের উল্লেখ করেন ও বলেন, 'হিন্দু', 'হিন্দুত্ব', 'Hinduism' - এই শব্দাবলীর কোনো সংকীর্ণ অর্থ নির্ধারণ করা যায় না। হিন্দুত্ব শব্দের অর্থের সারসংক্ষেপ একটি ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভারতীয় উপমহাদেশের জীবন পদ্ধতির সঙ্গে 'হিন্দুত্ব' সংযুক্ত বলে তিনি এই রায়ে উল্লেখ করেন। এই রায়ে সুপ্রীম কোর্ট উল্লেখ করে, দ্বন্দ্বভাব, শত্রুভাব, পরধর্ম অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে 'হিন্দুত্বের' কোনো সম্পর্ক নেই। ২০০৫ সালে কেরলের গুরুভায়ুর দেবস্বম মন্দিরের ম্যানেজিং কমিটিতে কমিউনিস্ট মন্ত্রীদের সদস্যপদকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা মামলার রায়েও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এইচ কে সেমা ও এসবি সিনহার বেঞ্চ গুরুভায়ুর দেবস্বম আইনের উল্লেখ করে হিন্দুত্বের সঙ্গে সর্বব্যাপী ভারতীয় জীবন পদ্ধতির সম্পর্কের প্রতিধ্বনি করে।

উলুবেড়িয়ায় বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১০ সেপ্টেম্বর উলুবেড়িয়া শহরের কাছে যদুবেড়িয়াতে 'বাস্তুহারা সহায়তা

সমিতি'-র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। সমিতির সম্পাদক অরিন্দম সিংহরায় নিজ বাসভবনে এই সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। সমিতির সদস্য ছাড়াও আরও কয়েকজন আমন্ত্রিত সদস্য-সদস্যা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া জেলা / বিভাগের কয়েকজন কার্যকর্তা বিশেষ আমন্ত্রিত ছিলেন। সব মিলিয়ে ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাদের কাছে একটা বনভোজনের মতো আমেজ ছিল। বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রী অজয় নন্দী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ শ্রী অদ্বৈত চরণ দত্ত, শ্রী সারদা প্রসাদ পাল (কোলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক) প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণ দেন শ্রী অজয় নন্দী এবং সমাপ্তি ভাষণে শ্রী দত্ত বলেন, সমিতির যতটা সম্ভব কাজকর্ম (লেখা সহ) বাংলা ভাষায় করা এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যবহারে 'স্ব'-বোধ-এর বা নিজেদের ভাবনা-চিন্তার সঠিক প্রতিফলন দরকার। কলকাতায় সমিতির পুরনো বাসস্থান সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হয়। সম্পাদক মহাশয় গত আর্থিক বছরের প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় পেশ করেন। সব শেষে শ্রী অজয় নন্দীর সভাপতিত্বে আগামী আর্থিক বছরের নতুন সমিতি গঠিত হয়। সবশেষে শান্তি মন্ত্র পাঠ করা হয়।

বেহালায় বিবেকানন্দ পাঠচক্রের শ্রীঅরবিন্দ স্মরণ

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।। গত ১৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যায় অরবিন্দ অনুরাগী মানুষ বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের ডাকে সাড়া দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির বেহালা শাখার সভাকক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ

সোসাইটির সদস্য দেবীপ্রসাদ রায়ের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'প্রথম স্বাধীনতা দিবসে শ্রীঅরবিন্দের বাণী'। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী পঙ্কজ কুমার দত্ত (প্রাক্তন আইজি, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ), ড. সুভাষ সাহা (প্রাক্তন অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি) এবং শ্রী গৌতম ব্যানার্জী (সদস্য, শ্রীঅরবিন্দ ভবন)। অনুষ্ঠানের প্রথমেই পাঠচক্রের সভাপতি স্বপন কুমার ঘোষ উপস্থিত তিন জন বিশিষ্ট বক্তাকে পুষ্পার্ঘ্য ও উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করেন। শ্রী গৌতম ব্যানার্জী তাঁর বক্তব্যের সামনে শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্নগুলোকে খুব সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেন। তিনি সাম্প্রতিক কালে বহুল চর্চিত 'গ্লোবাল সাউথ' বিষয়টির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্নের সাদৃশ্যটিও তুলে ধরেন। ড. সুভাষ সাহা শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি জি-২০-র মূল আদর্শের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের মেলবন্ধনের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। সর্বোপরি পঙ্কজ কুমার দত্ত মহাশয় খুব দক্ষতার সঙ্গে অরবিন্দের কারাজীবন এবং অরবিন্দের আদর্শ আগামী দিনে কোন্ পথে বাস্তবে রূপায়ণ সম্ভব তা তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া ফাল্গুনী ঘোষাল স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে অজ্ঞাত বিপ্লবীদের জীবন কাহিনী তুলে ধরার কথা বলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পাঠচক্রের সম্পাদক এই প্রতিবেদক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্র,; ২০২২ সাল থেকে শ্রীঅরবিন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করেছে।

ইতিমধ্যে বেহালার ৪০টি স্কুল ও ৬টি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শন নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং ভারতবাসীর ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই

কল্যাণ গৌতম

ব্রিটিশ ভারতে বিপ্লব, সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি ছিল দ্বিবিধ। এক, মহারাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং দুই, বঙ্গীয় আদর্শ। মহারাষ্ট্রীয় আদর্শে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ দুই ধর্মগ্রন্থ মহাভারত ও গীতা এবং লোকমান্য তিলক সৃষ্ট দুই উৎসব— 'শিবাজী উৎসব' ও 'গণপতি উৎসব' আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিল। বঙ্গীয় আদর্শে স্বামীজী ও বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং তার সঙ্গে মহাকালী ও দেবীদুর্গা-ভবানীর আরাধনা হয়ে উঠেছিল প্রেরণার উৎসস্থল।

মহারাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্যে রচিত হয় 'গণপতি-শ্লোক', যার টেক্সটে ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে রয়েছে তীব্র সংগ্রামের মনোভাব। পূজার অছিলায় যুবসমাজ তখন টগবগ করে ফুটছে। সামনে দেবতা, পিছনে দুর্দম শপথ। গণেশ পূজার মধ্যে যুক্ত হয়ে গেল ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই। গণেশ চতুর্থী পালনের মধ্যে আজও নিহিত রয়েছে স্বাধীনতার স্পৃহা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন। গণেশ দেবতার ধ্যান ও ষোড়শোপচার পূজার মধ্যে এক অদম্য উচ্ছ্বাস, এক তারুণ্যের ছোঁয়া, এক কালজয়ী ইতিহাস রচনা হয়ে যায়। ইতিহাস তার সাক্ষী।

গণপতি বাপ্পা সিদ্ধিদাতা, তিনি সকল কর্মের প্রারম্ভে স্মরণ-মননের যোগ্য-শক্তি। তিনি অস্ত্র বিহীন নন। তাঁর চার হাত। এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র, তৃতীয় হাতে গদা, চতুর্থ হাতে পদ্ম। তাই তিনি মহাবল এবং পূজা-সিদ্ধির অনুকুল দেবতার আগে তিনি পূজ্য, স্মরণযোগ্য। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে একদা বাঙ্গালি সফল ভাবে বাণিজ্য-কর্ম করেছে, ময়ূরপঙ্খী নৌক ভাসিয়েছে। অতীতের সেই গৌরবের, সেই সাফল্যের দিন কী আর ফিরে আসবে না? গণপতি বাপ্পাই জানেন, বাঙ্গালির সিদ্ধিলাভ কবে হবে! বাঙ্গালি তার বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে হারিয়েছে, সে ইতিহাসটুকু যথার্থভাবে লিখে রাখতেও পারেনি। বলা যায়, চায়নি লিখে রাখতে।

গণেশ এবং কার্তিকের সহাবস্থান চাই। যেমন চাই লক্ষ্মী-সরস্বতীর সহাবস্থান। তবে বাঙ্গালি সফল হবে। কার্তিকের আরাধনা মানে, শক্তির পূজা, সাহসী হবার প্রার্থনা; সেনাপতির মতো সাহস, অজেয় পুরুষত্ব। নেতৃত্বের সাহস কি আমরা হারিয়ে ফেলছি? বাঙ্গালি নিজেরাই কি নিজেদের হারিয়ে দিয়েছে? 'ময়ূরপঙ্খী নৌকো'

মানে কার্তিকের ক্ষাত্রশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্য। ময়ূর তাঁর বাহন। রূপক-সংকেতে 'ময়ূরপঙ্খী নৌকা' হয়ে দাঁড়ায় বীরত্বের সঙ্গে ব্যবসা, সুদূরের হাতছানি, এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র। ভর্তুকি-নির্ভর বাঙ্গালি জাতি ব্যবসা করবে কি! ভর্তুকি ভেতরে ভেতরে আমাদের ভয়ানক জেদকে জল করে দেয়। ভর্তুকি মানুষকে পথের ভিখারি করে দেয়। ভর্তুকি ব্যবসায়ী করে তোলে না কখনও। সিদ্ধিলাভের তো প্রশ্নই নেই।

পেটে বিদ্যা না নিয়ে অবৈধ-সম্পদের মালিক হওয়া যা, 'ভীতুর-ডিম' বাঙ্গালির ব্যবসায়ী হওয়াও তাই। শুধু খেরোখাতা থাকলেই হয় না, খেরোখাতা রক্ষা করার বীরত্বটুকু থাকা চাই। পূর্ব পাকিস্তানে/বাংলাদেশে বাঙ্গালির বণিক তার খেরোখাতার দখল রাখতে পারেনি। তাই গণেশ আর কার্তিকের যুগ্ম-আরাধনার স্বপ্ন দেখাতে হবে বাঙ্গালিকে। পাশের ব্যবসায়ীর 'গণেশ উলটিয়ে' বাঙ্গালি কখনও বড়ো হতে পারবে না।

ভারতের অন্তরের ধাত্রী অরণ্য। ভারতের শিক্ষালাভ সম্পন্ন হতো তপোবনের সামীপ্যে সান্নিধ্যে। তারই ফুলে-ফলে-পল্লবে-শাখায় একদিন মানুষ বেড়ে উঠেছিল। অরণ্যে অতিবাহিত করে পশুত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে নরত্বে এবং সেই পথ ধরে দেবত্বে উপনীত হয়েছে ভরতের মানুষ। অরণ্যের হাতি-দেবতা হয়েছেন 'সিদ্ধিদাতা গণেশ'। উত্তরবঙ্গের কৌমসমাজও হাতি-দেবতা 'মহাকাল'-এর নিত্য স্মরণ করে।

গণেশ কল্পনায় যেন অরণ্য-কৃষির যুগলবন্দি। কৃষিজীবী মানুষ মাত্রেই জানেন, হাতি অরণ্য সন্নিহিত কৃষিক্ষেত্রে কতটা বিঘ্নকারী পশু! পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে যখন দলমা পাহাড় থেকে দলে দলে হাতির পাল নেমে এসে ফসলের জমি তছনছ করে যায়, তখন তাকে কী বলা যাবে, দেবতা? হাতি নিজেই বিঘ্নকারী আর বিঘ্নের প্রতীক। গণেশের বাহনটিও তো তাই— ইঁদুর পাকা ফসল কাটে, যত না খায় তার চাইতে ঢের সংগ্রহ করে তার গর্তে। সুতরাং একদিকে হাতি, আর একদিকে ইঁদুর। হাতিমুখো গণেশ সওয়ার হয়েছেন কিনা অলক্ষ্মীরূপী ইঁদুরের পিঠে।

কৃষিজীবনের পরতে পরতে এরা সর্বনাশের প্রতিভূ। অন্তত হাতিমুণ্ডধারী, ইঁদুর বাহন ফসল-বন্ধু হতে পারেন না। আর এখানে রয়েছে এক মনস্তাত্ত্বিক লোক-দর্শন, চিন্তার বৈপরীত্য। ভয়ে-ভক্তিতে এক বিঘ্নকারী শক্তি হয়ে ওঠে বিঘ্ননাশক দেবতা। বিঘ্নকারীকে নিয়ে জীবন অতিবাহিত না করে বিঘ্ননাশকের দরকার লোকসমাজের। মানুষ কল্পনা করলো— যিনি দুর্গতির হেতু তিনিই আবার কল্যাণময়; তাই ইঁদুর বাহন হস্তিদেবতা যেন ছেড়ে দিয়েছেন তার চিরাচরিত বিঘ্নকারী স্বভাব। চিন্তার এই বৈপরীত্যে ভয়ংকর-শক্তি হয়ে যায় শুভঙ্কর-শক্তি। আর সে কারণেই ফসল ভক্ষণকারী হাতির পাল হয়ে দাঁড়ায় কৃষি সহায়ক দেবতা।

নৃতত্ত্বের ভাষায় গণেশ হচ্ছেন থেরিওমর্ফিক দেবতা বা অর্ধ-মানুষ দেবতা; তার মুণ্ডটি প্রাণীর আর বাকি অংশটি মানুষেরই মতো। অরণ্যের প্রান্তবাসী লোকসমাজের কাছে গণেশ কেবল হস্তীদেবতাই নন, তিনি হাতিদেরও দেবতা। গণেশ তার হাতি রূপে বন্যপ্রাণী আর অরণ্য-কেন্দ্রিক মানব সভ্যতা— বনের ফল-মূল সংগ্রহ আর পশুশিকারই মানুষের খাদ্য-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল; কৃষি-সভ্যতা এসেছে অনেক পরে।

বন ছেড়ে মানুষ যখন বন-সংলগ্ন জমি হাসিল করে চাষবাদ শুরু করলো, তার লোভে দলে দলে আবির্ভূত হলো বনের শাকাহারি, তৃণভোজী পশুর দল। তাদের থেকে ফসলকে বাঁচাতে আদিম মানুষ সতর্ক হলো। আর তাদের প্রাচীন রীতিতে বনের পশুকে সন্তুষ্টকরণ করতে উদ্ভূত হলো হস্তী দেবতা, তিনি আজকের সিদ্ধিদাতা গণেশ। আজও সেই সিদ্ধিদাতা গণেশের জন্মতিথিতে (গণেশ চতুর্থী) নবনির্মিত সংসদ ভবনে প্রবেশ--- আমাদের মহান পরম্পরার সাক্ষ্য বহন করে। □

শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত সাধু নাগ মহাশয়ের শক্তি সাধনা

নিতাই নাগ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপরিমণ্ডলে দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের নাম অতি পরিচিত। তিনি গৃহী হয়েও কঠোর তপস্যায় সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে গৃহে থেকে ঈশ্বর সাধনা করতে বলেছিলেন। ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা, নিষ্ঠা, দীনতা, অহংশূন্য ভাব, সাধুজনোচিত আচরণ প্রভৃতি দৈবীগুণ তাঁকে 'সাধু নাগ মহাশয়' নামে সকলের কাছে অভিহিত করেছিল। তিনি সাধকদের সাধন জীবন সম্বন্ধে বলতেন— 'যত থাকে গুপ্ত, তত হয় পোক্ত। আর যত হয় ব্যক্ত, তত হয় ত্যক্ত।' তার ফলে তাঁর ধর্ম জীবনের অভ্যন্তরীণ বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর জগন্নাথের প্রতি ভক্তিসূচক স্বরচিত কয়েকটি গান পাওয়া যায়। তিনি কুলগুরু শাক্ত সাধকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। জগতের নারীদের জগন্মাতা জ্ঞানে অন্তরে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন আর বলতেন— 'দেখ, পশুপক্ষীর যোনি পর্যন্ত আমি আজন্ম মাতৃযোনির ন্যায় দেখিয়াছি।' শাক্ত হয়েও মহাপ্রভুর আদর্শে পরম বৈষ্ণবের ন্যায় তাঁর জীবন ব্রত ছিল— 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মান দেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।' নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভেবে দীনতার ভাব, জগৎ সংসারের অগ্নিময় ক্ষেত্রে বিচরণকালীন অসাধারণ সহ্যশক্তি এবং সকলকে সম্মান দিয়ে নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা আর সদাসর্বদা ঈশ্বরের নাম-গুণগানে মুখরিত মগ্ন থাকা তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ছিল।

নাগ মহাশয়ের জীবনকাল (১২৬৩-১৩০৬) মাত্র ৪৩ বছর। জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে দেওভোগ গ্রামে। বাল্যকালে গর্ভধারিণী মা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে হারান। বিধবা পিসিমার মাতৃস্নেহে লালিত-পালিত হন। নারায়ণগঞ্জে পাঠশালায় পড়াশোনার পর তিনি ঢাকায় নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। তারপর সেখান থেকে শেষ পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতায় ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজে (মতান্তরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে) দেড় বছর পড়ার পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক রূপে অসাধারণ দক্ষতা ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। পিতা দীনদয়াল কলকাতায় কুমোরটুলিতে এক ব্যবসায়ীর গদিতে সামান্য চাকরি করতেন আর কুমোরটুলিতে একখানি খোলা ঘরে থাকতেন। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় পিতা পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেদাজেদি করে পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ দান করেন।

নাগ মহাশয়ের অন্তরে বৈরাগ্যভাব ছিল তীব্র। প্রথমা স্ত্রীর এবং মাতৃসমা পিসিমার মৃত্যুর ঘটনায় তিনি জগতে জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুভব করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নাগ মহাশয়কে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি জনকের মতো গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে। তোমায় দেখে লোক অবাক হবে।' সংসারে ভাত- কাপড়ের অভাব হবে না— তাও জানিয়ে দেন।

পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, ঠাকুরের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। গৃহে সংসারের মধ্যে থেকে তাঁর কঠোর তপস্যাময় জীবন ও অসীম ঈশ্বরানুরাগ সত্যই সকলকে অবাক করেছিল। ঠাকুরের তিরোধানের পর মা সারদার কাছে যান। মাতৃদর্শন ও প্রণামের পর ফিরে এসে নাগ মহাশয় বলেছিলেন, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।' মাতৃসাধক হিসাবে তিনি মাতৃমহিমা অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। ঠাকুরের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, গিরিশ ঘোষ, সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ প্রমুখ অনেকে নাগ মহাশয়ের সাধক হিসেবে উচ্চ অবস্থার প্রশংসা করেছেন। স্বামীজী তো বলেছেন, 'নাগ মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের এক অসাধারণ কীর্তি।'

দেহত্যাগের কিছুদিন আগে শয্যাশায়ী অবস্থায় নাগ মহাশয় কালীপূজা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সহধর্মিণী বিধিমতো পূজার ব্যবস্থা করেন। রক্ষাকালীর প্রতিমা তাঁর মাথার কাছে রেখে দেখতে বললে তিনি চোখ খুলে প্রতিমা দর্শন মাত্রই 'মা মা' বলতে বলতে গভীর সমাধিদশা প্রাপ্ত হন। তারপর কালীনাম উচ্চারণ করলে তাঁর সমাধি ভঙ্গ হয়। মহাসমাধি লাভের তিনদিন আগে পঞ্জিকা দেখে মহাযাত্রার দিন-ক্ষণ স্থির করেন। ১৩০৬ সনে ১৩ পৌষ তাঁর মুহুর্মুহু ভাব হতে থাকে। ঠাকুরের ছবি তাঁর সামনে তুলে ধরে বলা হয়— 'যাঁর নামে আপনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, এই তাঁর প্রতিমূর্তি।' ঠাকুরের ছবি দেখে হাতজোড় করে প্রণাম করেন আর ক্ষীণকণ্ঠে বলেন— 'কৃপা কৃপা— নিজ গুণে কৃপা!' তারপর ঘন ঘন শ্বাস নেওয়ার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে। মৃত্যুর আগে তিনি যে কালীপূজা করেন সেই কালীপ্রতিমা দেহের পূত ভস্মরাশি পিতলের কলসে রেখে চিতাভূমিতে প্রোথিত করে তার উপর মাতৃমূর্তিখানি স্থাপন করা হয়।

বলরাম জয়ন্তী পালনের তাৎপর্য

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩; ৩র আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ভাদ্র শুক্লাষষ্ঠীতে এবছর ভারতীয় কৃষকসমাজে কৃষি ও গো-পালনের দেবতা ভগবান বলরাম জয়ন্তী পালিত হলো। ভারতীয় কৃষকের আরাধ্য দেবতা বলরাম।

থমাস হার্ডির লেখা 'ইন দ্য টাইম অব দ্য ব্রেকিং অব নেশনস' কবিতাটি যখন হায়ার সেকেন্ডারি পড়ি, আমার এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কবিতাটি পড়াতে গিয়ে ভগবান বলরামের কথা বলেছিলেন। কবিতায় আছে, 'Only thin smoke without flame/From the heaps of couch-grass;/Yet this will go onward the same/Though dynasties pass.' যুদ্ধ হবে, জাতির পতনোত্থান ঘটবে, সাম্রাজ্যের বদল হবে, তবুও কৃষিক্ষেত্রে একই ভাবে ফলদায়ী হবে, কৃষক আপন জমিতে লাঙ্গল দিয়ে মাটির ঢেলা ভাঙবে, জমিতে আগাছা-ঘাসের আগুন-ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশে উঠবে। সভ্যতা আপনার প্রয়োজনের গতিতে এগিয়ে চলবে, থেমে যাবে না।

জানা যায়, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হলধর ভগবান বলরাম কোনো পক্ষই অবলম্বন করেননি। তিনি তীর্থে তীর্থে যাবার পথে পথে কৃষক সমাজকে কৃষিকাজে উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন। কারণ বহু কৃষক বহু রাজার সৈন্যরূপে যুদ্ধে গেছেন, কৃষিকাজ না হলে বিপুল মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ হয়ে যাবে। আপন আচরণে এই বার্তাটি দেবার মাধ্যমে ভগবান বলরাম বুঝিয়েছেন, দল-নিরপেক্ষভাবে, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষভাবে সকল কৃষককে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কৃষির মাধ্যমে দেশহিতৈষণায় নিয়োজিত থাকতে হবে। কিন্তু কৃষিকাজ থেকে কৃষক যেন আপন সৌকর্যে আপন প্রাপ্তি লাভ করেন, তার জন্যও ভগবান অনন্ত আশীর্বাদ রেখে গেছেন। ভগবান বলরাম আমাদের প্রেরণা দিয়েছেন, কীভাবে সকল বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে আত্মবল, আত্মবিশ্বাস ও

সংগঠিত শক্তিকে সঙ্গী করে দুষ্টের দমন করা যায়, আরাদ্ধ কাজ সমাপ্ত করা যায়। শ্রীবলরাম কৃষক চৈতন্যকে জাগ্রত করার এক মহাশক্তি— কৃষির বিকাশ ও উন্নয়নের দেবতা।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভগবান বলরামকে দুধ আর পুত্রের দাতারূপেও পূজা করা হয়। তাঁর জন্মদিনে সমগ্র ভারতের নানান অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় উৎসব। মহিলারা ব্রত উদ্‌যাপন করেন। অনুষ্ঠিত হয় মেলা ও কৃষি-কৃষ্টির নানান উৎসব। এই দিনটিকে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ তাদের প্রেরণাদায়ী দেবতার আবির্ভাব তিথিরূপে বিশেষ মর্যাদা পালন করে। ভাদ্রের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় বলরাম জয়ন্তী। তিনি কেবল পরম্পরাগত চাষের দেবতা নন, তিনি চাষের প্রকার, সেচন প্রক্রিয়া ও বিকাশের আশীর্বাদক। উন্নত কলাকৌশলে চাষাবাদ, তারই সুবাদে ধন-ধান্যে সম্পদশালী জীবনের তিনি ভারতীয় প্রেরণা। তাঁর অস্ত্র 'হল', তাই নাম 'হলধর' বা 'হলায়ুধ', অর্থাৎ লাঙ্গলধারী ঈশ্বর তিনি, কৃষিকৃষ্টির দেবতা। লাঙ্গল হচ্ছে কৃষি ও গ্রাম বিকাশের লক্ষ্যে এক নির্মাণের প্রতীক। কিন্তু নির্মাণের জন্য অশুভ শক্তিকে, অধর্মকে পরাস্ত করতে হয়, দুষ্টকে দমন করতে হয়, তার জন্যও আয়ুধ দরকার। সেই আয়ুধ হলো মুষল, যা ধার্মিক আর শিষ্টলোককে পালন ও রক্ষণে সহায়তা করে।

কে এই বলরাম?

তিনি বসুদেব ও রোহিণীর পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শুভ্র গাত্রবর্ণ তাঁর। তিনি বলদেব, বলভদ্র, অমিত শক্তির অধিকারী। আপন বলে অতিশয় উন্নতির এক ঐশী নাম হচ্ছে 'বলভদ্র'। তিনি 'সঙ্কর্ষণ', কারণ তিনি দেবকীর সপ্তম গর্ভ, যোগমায়া সেই গর্ভ সঙ্কর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে সংস্থাপন করেছিলেন, তাই তার নাম হলো 'সঙ্কর্ষণ'। তিনি 'শেষনাগ', নাগরাজ শেষের অবতার, তার মধ্যেই এই নাগ অবস্থান করতেন। দেখা যায়, মৃত্যুকালে যদুবংশ ধ্বংসের আগে, কৃষ্ণের মৃত্যুর আগে যোগসমাহিত ধ্যানস্থ বলরামের মুখ-গহ্বর থেকে লাল রঙের হাজার-মুখো-সাপ বেরিয়ে এসে সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। 'বলরাম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই রকম— 'বল' শব্দে অর্থ 'শক্তি', আর 'রাম' কথাটির অর্থ 'রমণ' বা 'আনন্দ', আধ্যাত্মিকতার আনন্দ, একত্রে বলরাম, শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে বলরামের আবির্ভাব।

দ্বাপর যুগে তিনি যেমন শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ, ত্রেতা যুগে তিনি শ্রীরামের অনুজ। দুই যুগেই তিনি শ্রীবিষ্ণুর মূল আধার রাম ও কৃষ্ণের সহায়ক শক্তি, তাদের বহুবিধ বিপদের সহায়তাকারী। বলরাম গদাযুদ্ধে পারদর্শী এবং ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের শিক্ষাগুরু।

বলদেবের ধ্যান :

ওঁ বলদেবং দ্বিবাহুঞ্চ শঙ্খকুন্দেন্দুসন্নিভম্।
বামে হলাধুধবরং দক্ষিণে মুষলং করে।
হালালোলং নীলবস্ত্রং হেলাবন্তং স্মরেৎ পরম্।

প্রণামমন্ত্র : নমস্তেহস্তু হলগ্রাহ নমস্তে মুষলায়ূধ। নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল।। নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর। প্রলম্বারে নমস্তেহস্তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূরবজ।।

ভারতবর্ষের প্রতিটি গৃহেই পালিত হোক এই পবিত্র তিথি। যিনি অন্নগ্রহণ করেন, তিনিও বলরামের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। কারণ বিশ্বের বহু কোটি মানুষের মুখে এখনও ক্ষুধান্ন অধরা। সমগ্র বিশ্ব যাতে পুষ্পপত্রে সুশোভিত হয়ে ওঠে আমরা তারই প্রার্থনা জানাবো। ◘

কলকাতায় ক্যাম্ব-এর উদ্যোগে আলোচনাসভা। বক্তব্য রাখছেন মোহিত রায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জেহাদিদের সক্রিয়তা ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। এর ফলে শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতেও ফের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান বাসিন্দা ভারতের বন্ধুভাবাপন্ন জনগোষ্ঠী। ভারত ও মায়নমার সীমান্ত এবং চট্টগ্রাম বন্দর ঘেঁষা এই পার্বত্য অঞ্চলে যদি ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠীর সক্রিয়তা বাড়তে থাকে তাহলে শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারত-সহ গোটা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিও চরম জাতীয় নিরাপত্তার হুমকির মুখোমুখি হবে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ক্যাম্ব (ক্যাম্পেন এগেনস্ট অ্যাট্রোসিটিস)-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভায় একথা বলেন মোহিত রায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার সমস্যার বিষয়টিতে ভারত ও আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই এই সভার আয়োজন বলে তিনি জানান।

কিউবা থেকে আরম্ভ করে ভিয়েতনাম, নিকারাগুয়া, প্যালেস্তাইন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ঘুম না থাকলেও পাশের বাংলাদেশের হিন্দু ও চাকমাদের উপর জেহাদিদের নির্যাতন নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন নই। শ্লেষের সুরে কথাগুলি বলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু আশংকা প্রকাশ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম যদি সত্যিই স্বকীয়তা হারায় তবে তা ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ের ক্ষেত্রেই বিপদ ডেকে আনবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এদেশের অরুণাচল প্রদেশ ও অন্যান্য জায়গায় শরণার্থী হয়ে যারা এসেছেন, তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়টি ভারত সরকারকে ভাবতে হবে। উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯৮.৫ শতাংশই ছিল বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে এই এলাকা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে এখানকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। আর তখন থেকেই অমুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় নিপীড়ন-নির্যাতন চলছে। সমতল জেলাগুলি থেকে রোহিঙ্গা-সহ ৫ লক্ষ বাঙ্গালি মুসলমানকে তুলে নিয়ে গিয়ে এই এলাকায় বসতি গড়ে তোলা হচ্ছে।

গত ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বর্তমান শাসকদল আওয়ামি লিগ পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু ২৫ বছর পেরিয়ে গেলেও সেই চুক্তি রূপায়িত হয়নি। ফলে ৯২,৫০০ পরিবার নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেসবা কামাল এই তথ্য জানান। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহসভাপতি ঊষাতন তালুকদার-এর অনুরোধ, ভারতীয় বাঙ্গালিরা যদি মনে করেন, ২৫-২৬ বছর আগের চুক্তি বাংলাদেশ সরকারের অবশ্যই বাস্তবায়িত করা দরকার, তাহলে তারা ভারত সরকারের কাছে আবেদন করুন। পার্বত্য চট্টগ্রামের হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এতে আশ্বস্ত বোধ করবেন।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

‘যার মাথায় দিদির হাত সেই খায় জেলের ভাত!’

বরুণ মণ্ডল

বঙ্গ রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু এখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ইউরোপ সফর এবং তার প্রিয় সপার্ষদদের বিদেশ ভ্রমণ। সারদা চিটফান্ডে অভিযুক্ত এবং প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি জীবন কাটিয়ে আসা কুণাল ঘোষ এবং ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সঙ্গী হওয়া নিয়ে জোর চর্চা চলছে। সে প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা।

রাজনীতিতে নামা নিয়ে গত লোকসভা নির্বাচনের আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চমক ছিল চরমে। মিডিয়া-সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল মহারাজের রাজনীতিতে পদার্পণের খবর। বিজেপি নেতাদের আনাগোনাও চলেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্দরমহলে। কলকাতার ব্রিগেড সমাবেশে মিঠুন চক্রবর্তী এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতি হওয়ার খবর চাউর হয়ে গিয়েছিল। যদিও সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুধু ‘জাত গোখরো’ মিঠুন চক্রবর্তী ‘এক ছোবলে ছবি’ করতে বিজেপির ব্রিগেডের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। বাম জমানায় সৌরভ গাঙ্গুলী ছিলেন বাম ঘনিষ্ঠ। প্রাক্তন এবং প্রয়াত বাম নেতা সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে সৌরভ গাঙ্গুলীর মাখোমাখো ভাব সর্বজনবিদিত। পরবর্তীতে অভিযোগ ওঠে সুভাষ চক্রবর্তীর হাত ধরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অনেক অনৈতিক সুবিধা নিয়েছিলেন। বিশেষ করে তার ক্রিকেট অ্যাকাডেমী গড়তে কলকাতাতে জমির সংস্থান করতে সুভাষবাবুর বদান্যতা অনেকখানি। সেই হিসেবে বামপন্থীরা সৌরভ গঙ্গেপাধ্যায়কে ‘ঘরের লোক’ ভেবে এসেছে। কিন্তু সরাসরি বামপন্থী রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন।

> জীবনে প্রচুর ঝড়ঝাপটাকে তিনি সুকৌশলে ‘ডজ’ করে এসেছেন। ক্রিকেটের মতো অনেক সমস্যাকেই তিনি ‘স্টেপ আউট’ করে ছক্কা হাঁকিয়েছেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ধুরন্ধর রাজনীতিবিদকে তিনি কেন ট্যাকল করতে পারছেন না, অথবা তাঁর রাজনীতির খোঁয়াড়ে কেন মাথা গলাবেন, এ প্রশ্ন তাঁর ফ্যান ফলোয়ার্সদের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডীয় ক্রিকেটার অ্যান্ড্রু ফ্লিনটপের গায়ের জার্সি ওড়ানোর প্রতিবাদ হিসেবে লর্ডসের মাটিতে একই কায়দায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজের পরিহিত জার্সি উড়িয়েছিলেন। ক্রিকেট বিশ্বে এটা

ফঃ ৫

হয়ে উঠেছিল চরম প্রতিবাদের প্রতীকি চরিত্র। এছাড়া ক্রিকেটে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে বারবার অপমানিত হয়েও নিজেকে মেলে ধরা এবং ভারতের অধিনায়ক হিসেবে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা প্রতিটা বাঙ্গালির মন কেড়ে নিয়েছিল। তাই তিনি আদরের 'মহারাজ'। রাজনীতির বিষবাষ্প তাকে কখনোই আঁকড়ে ধরতে পারেনি। বিশ্বের জনপ্রিয়তম প্রধানমন্ত্রীর হাতছানিকেও কৌশলে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলতি বিদেশ সফরে তার সশরীরে হাজির থেকে বাংলার শিল্পপতি হওয়ার ঘোষণা সত্যিই বিস্ময়কর।

নানা রকম প্রশ্ন উঠছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা কথা প্রবাদ হয়ে উঠেছে, তা হলো 'যার মাথায় দিদির হাত, সেই খায় জেলের ভাত।' অর্থাৎ দেশের রাজনীতিতে 'দিদি' বলে খ্যাত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ব্যক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার করেছেন তারই পরবর্তী ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, পেশাগত জীবনে 'কালসময়' এসে উপস্থিত হয়েছে। হতে পারে এটা কাকতালীয় ঘটনা কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিখ্যাত বা মধ্যম মানের এই সমস্ত ব্যক্তিদের মাখোমাখো ভাবের পর থেকেই দুর্যোগ নেমে এসেছে। যেমন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেছিলেন; সোশ্যাল মিডিয়াতে দাবি করা হচ্ছে তারপরেই নাকি ইমরান খানের দুর্ভাগ্য চরমে এসে পৌঁছেছে; তাঁর দেশের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে! এদেশের ক্ষেত্রে অনুব্রত মণ্ডল, পার্থ চ্যাটার্জিরা তো আছেনই। এদের ওপরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদের হাত ছিল কিন্তু তারা আজ এখন জেলে। বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। চিটফান্ড সংস্থা 'অ্যালকেমিস্ট'- এর ডিরেক্টর কে.ডি. সিংহকে রাজ্যসভায় সদস্য করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্থাৎ মিস্টার সিঙের উপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছিল। তিনিও আজ গ্রেপ্তার। অন্যদিকে তাপস সাহা, সুকন্যা মণ্ডল প্রমুখ আজ জেলে। এদের সবার উপরেই নাকি মমতা ব্যানার্জীর বিশেষ কৃপা ছিল।

বাংলাদেশি অভিনেতা ফিরদৌস এবং গাজী নূর এদেশে এসে দমদমের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত এবং রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কানহাইয়া লালের হয়ে ভোট প্রচার করেছিলেন। অর্থাৎ তাদের উপর তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদের হাত ছিল। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাদের ভিসা বাতিল করেছে। আন্তর্জাতিক আইনে তারা ফেঁসে রয়েছেন, হতে পারে জেল। এই সমস্ত পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, যদিও কাকতলীয় ঘটনা তবুও 'যার মাথায় দিদির হাত সেই খাবে জেলের ভাত' স্লোগানটি অত্যুক্তি নয়। আরেকটি রাজনৈতিক অন্তর্দর্শন বলছে তৃণমূলের দুর্নীতি এবং জনবিরোধী কর্মকাণ্ডের তোয়াক্কা না করে যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের গুণগান গাইছেন, তাদের সেই গুণগান গাওয়ার প্রধান কারণ 'যার নুন খাওয়া হয়, তার গুণ গাওয়া হয়', প্রবাদকে সমর্থন করা। অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তি মমতা ব্যানার্জীর দুর্নীতিকে সমালোচনা না করে তাতে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

পরবর্তীকালে দেখা গেছে তারাই ব্যক্তিগত স্তরে দুর্নীতিতে যুক্ত এবং তাকেও ইনফর্মেন্স ডিরেক্টরেট ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করছে। যুবনেতা কুন্তল ঘোষ তৃণমূল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বড়ো বড়ো কথা বলতেন। তিনিও আজ তদন্তকারীদের জালে পড়েছেন। নিয়োগ দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে সাব্যস্ত বিধায়ক তাপস সাহা তো জনসমক্ষেই বলেছেন যে তার উপর দিদির হাত আছে, তাকে কেউ কিছু করতে পারবে না।

রাজনৈতিক এই অন্তরদর্শনের সূত্র ধরে বাঙ্গালির মনে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে যে বাঙ্গালির আদরের 'মহারাজ' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বয়সে এসে কি প্রয়োজন পড়লো দেশের দুর্নীতিগ্রস্তদের মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর সঙ্গী হওয়ার। এ রাজ্যে ইস্পাত শিল্প তৈরি করতে হলে তাকে কেন স্পেনে গিয়ে মুখ খুলতে হবে? প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ফেরত প্রাক্তন আসামী কুণাল ঘোষের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদধন্য হওয়ার প্রয়োজন আছে বৈকি। কিন্তু সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের তেমন প্রয়োজনটা কিসের! ডাল মে কুচ কালা হে! সৌরভ গাঙ্গুলীর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি নিয়ে অতীতে উত্থাপিত জমি জটে কি নতুন ভাবে তিনিও ফেঁসে গেছেন? তৎকালীন অপ্রতিরোধ্য বাম আমলে সুযোগ-সুবিধা নিয়েও তিনি লাল জামা গায়ে চাপাননি, নরেন্দ্র মোদীর ঝড়েও তিনি তাঁর মাথা নোয়াননি, হঠাৎ কেন তিনি নীল-সাদার খপ্পরে পড়লেন!

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে 'যার মাথায় দিদির হাত তিনি খাবেন জেলের ভাত' এটা কুসংস্কার মনে হতে পারে। তবে ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্য করলে দেখা যায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাসী আছেন বা তিনি ধর্ম আচরণকে যথেষ্ট মর্যাদা দেন। তার চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে যে যারাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসছেন, তারা আপাত ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকলেও আইনের বেড়াজালে তারা নাস্তানাবুদ হচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এগুলো প্রতিহিংসাপরায়ণ তদন্ত উদ্যোগ বলা হলেও এখনো পর্যন্ত ইনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরের অধীনে যত সম্পদ/অর্থ বাজেয়াপ্ত হয়েছে বা যারা যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তারা এখনো না জামিন পেয়েছেন, না নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পেরেছেন।

সুতরাং তর্কের খাতিরে যদিও মেনে নেওয়া হয় যে তদন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হলেও তারা যে নির্দোষ এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য মতামত নয়। চিরকালই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয়েছে। জীবনে প্রচুর ঝড়ঝাপটাকে তিনি সুকৌশলে 'ডজ' করে এসেছেন। ক্রিকেটের মতো অনেক সমস্যাকেই তিনি 'স্টেপ আউট' করে ছক্কা হাঁকিয়েছেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ধুরন্ধর রাজনীতিবিদকে তিনি কেন ট্যাকল করতে পারছেন না, অথবা তাঁর রাজনীতির খোঁয়াড়ে কেন মাথা গলাবেন, এ প্রশ্ন তাঁর ফ্যান ফলোয়ার্সদের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এর সদুত্তর স্বয়ং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দিতে পারবেন এবং তিনি না দিলে সঠিক উত্তর দিয়ে দেবে সাধারণ মানুষ। অপেক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই। □

বাঙ্গালি বিশ্বকর্মার শিল্পকর্মে চমৎকৃত বিশ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী একাইহাট গ্রামের অধিবাসী সুরঞ্জন সরকার তাঁর হাতের জাদুতে কার্যত জগতবাসীকে বশ করেছেন! বছর চুয়ান্নর সুরঞ্জনের হাতের ছোঁয়ায় যেন প্রাণ পাচ্ছে গামারি কাঠের রাশি রাশি টুকরো। তাঁর তাকলাগানো কাষ্ঠখোদাই শিল্পকর্মে মোহিত দেশ-বিদেশের অসংখ্য গুণমুগ্ধ। সুরঞ্জনের নিপুণ হাতে তৈরি কাঠের শিল্পকর্ম পৌঁছে যাচ্ছে লন্ডন থেকে দুবাই, সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায়। এক কথায়, এই জগৎ সংসারের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে থাকা শিল্পরসিকদের ঘরের শোভা বাড়িয়ে তুলছে সুরঞ্জনের হাতে তৈরি নানাবিধ শিল্পকর্ম।

বছর কয়েক আগে তাঁর তৈরি একাধিক শিল্পকর্ম মালয়েশিয়াবাসী এক ব্যবসায়ীর মন কেড়ে নিয়েছিল। আরও একবার তাঁর শিল্পকর্ম মালয়েশিয়ায় যাওয়ার মুখে। এবার কাঠের দুর্গা, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ সেদেশের এক অনাবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য বর্তমানে প্রহর গুণছে। ভারতের তামিলনাড়ুর এক রপ্তানিকারকের মাধ্যমে প্রমাণ সাইজের মূর্তিগুলি বাক্সবন্দি হয়ে সেপ্টেম্বরেই কোলকাতা বন্দর থেকে জাহাজে চড়ে কয়েক হাজার মাইল দূরে মালয়েশিয়ায় পৌঁছে যাবে। এই মুহূর্তে মূর্তিগুলি দেখার জন্য শিল্পীর বাড়ির ওয়ার্কশপে উৎসাহীদের প্রতিনিয়ত আনাগোনা চোখে পড়ছে।

সুরঞ্জনের শিল্পকর্ম নিয়ে এলাকাবাসী এখন কার্যত চর্চায় মশগুল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ১ নং ব্লকের খাজুরডিহি পঞ্চায়েতের একাইহাটের বাসিন্দা সুরঞ্জন সরকার কাজের তাগিদে কৈশোরেই বাড়ি ছেড়েছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে পড়ে তিনি মাত্র পঞ্চম শ্রেণীতেই পড়াশোনায় ইতি টেনে হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন হাতুড়ি-বাটালি। প্রথমে কোলকাতায় গিয়ে কোনোরকমে মাথা গুঁজে পড়ে থেকে কাঠের কাজ শেখা। সেই সঙ্গেই চলতে থাকে তাঁর শিল্পসাধনা। একসময় টুকরো টুকরো কাঠের ওপর তাঁর আঁকিবুকির হাতটাও বেশ পাকিয়ে উঠলো। একটু একটু করে তাঁর হাতের হাতুড়ি আর বাটালির ছোট্ট ছোট্ট ঘায়ে সেই আঁকিবুকির রেখাগুলি পরিপূর্ণ রূপে ফুটে উঠতে লাগলো। এভাবেই দিন-মাস-বছর গড়াতে গড়াতে কর্মসূত্রে একসময় তিনি রাজ্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি জমালেন। পুঁথিগত শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত না হয়েও শুধুমাত্র কাষ্ঠখোদাই শিল্পকর্মকে ধ্যানজ্ঞান মনে করে সুরঞ্জন সরকার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছিলেন।

তবে, আর পাঁচ জনের মতো তিনি ছিলেন না। ব্যাঙ্গালোরে দীর্ঘদিন থাকাকালীন তাঁর লক্ষ্য ছিল কাষ্ঠখোদাই শিল্পকর্মের একটা স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি করা। তারপর একটু একটু করে সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং অবশেষে আজ তিনি একজন সফল উদ্যোগপতি। বর্তমানে তাঁর অধীনে আরও জনা দশেক কাষ্ঠশিল্পী কাজ করছেন। এদিকে নিজের পুঁথিগত শিক্ষা উল্লেখযোগ্য না হলেও তিনি তাঁর তিন মেয়ে ও এক ছেলেকে উচ্চশিক্ষার পাঠ থেকে কোনোভাবেই বঞ্চিত করেননি। বড়ো মেয়ে সঞ্চিতা ও মেজো মেয়ে মৌসুমী ব্যাঙ্গালোরে এবং ছোট মেয়ে সুস্মিতা কোলকাতায় উচ্চশিক্ষায় ব্যস্ত। সকলের ছোট ছেলে শিবম নামী বেসরকারি ইংরাজীমাধ্যম স্কুলের ছাত্র। স্ত্রী মালতী সরকার পুরোপুরি ঘরকন্যার কাজে নিজেকে সর্বক্ষণ জড়িয়ে রাখেন।

সুরঞ্জন সরকার বলেন, একমাত্র গামার (গামারি) কাঠের ওপর নকশার খাজ ঠিকঠাক হয়। এই দুর্গা, গণেশ ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তিগুলি গামার কাঠের তৈরি। এগুলি সেপ্টেম্বরের মধ্যেই মালয়েশিয়ায় চলে যাবে। প্রতিটিরই নকশা হাতে তৈরি করি। এখন তো যেখানে সেখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিনে খুব সহজেই কাঠে নকশা তোলার কাজ হচ্ছে। ইচ্ছে করলে আমিও পারতাম। কিন্তু তাতে যে নিজস্বতা থাকে না। আমার হাতে তৈরি নিজস্ব শিল্পকর্ম ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশের অনেকের ঘরে শোভা পাচ্ছে। এটা ভেবে যে আনন্দ পাই তা বলে বোঝানো যাবে না।

কাঠের কাজ করে স্বনির্ভর হয়ে সুরঞ্জন সরকার আজ এই প্রজন্মের সব কাষ্ঠশিল্পীদের কাছে প্রেরণার উৎস। ◻

পশ্চিমবঙ্গ দিবস ও ‘স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ড বাংলা’ সম্পর্কে কেন এই অনৃতভাষণ?

বিনয়ভূষণ দাশ

অতি সম্প্রতি (১৭ সেপ্টেম্বর) দেখলাম, অধ্যাপক সুগত বসু এক বিবৃতিতে বলেছেন, হিন্দু মহাসভা নয়, কংগ্রেসের ভোটেই পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়েছে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন সুগত বসু। কংগ্রেসের হিন্দু সদস্য-সহ অন্যান্য হিন্দু সদস্যের ভোটেই (৫৮-২১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়েছিল ১৯৪৭-এর ২০ জুন। একথা আমরা গত কয়েক বছর ধরে বলে আসছি। ঐতিহাসিকভাবেই তাই ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস। সুগত বসুরা তো এতদিন আমাদের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে আসছিলেন। হঠাৎ তাঁদের এই মত পরিবর্তন কেন? অবশ্য বিকৃত করে!

আসলে তাঁদের সমর্থিত সরকার ১ বৈশাখ ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ ঘোষণার পর থেকেই গোল বেঁধেছে। তলে তলে অনেকেই কেমন যেন বেসুরো গাইছেন। সম্প্রতি পুরাণবিদ (ঐতিহাসিকও?) নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীমশাই এক প্রবন্ধে বলেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পয়লা বৈশাখের দিনটিকে বেছে নেওয়া একটা গোলে-হরিবোল সমাধান।’ উনি লিখেছেন, ‘কেননা, ২০ জুনের মতো একটা দুঃখবহ এবং ভয়াবহ দিন, যেটা এতাবৎ অশ্রুতপূর্ব, অথচ পরিকল্পিত পূর্ব উপন্যাস, তা কখনও এপার বঙ্গের জন্মদিবস হতে পারে না।’ বুঝলাম ভাদুড়ীমশাই। তা কেন পারে না, একটু বুঝিয়ে বলবেন ভাদুড়ীমশাই। তা ‘হিরোশিমা দিবস’ হতে পারে, বাবরি মসজিদ ধ্বংস দিবস হতে পারে; কিন্তু ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস? নৈব, নৈব চ। ওই দিনগুলি কিসের স্মৃতি বহন করে নৃসিংহবাবু, একটু বলবেন? যাক, এহ বাহ্য!

বর্তমান প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আসল কথা হলো, গোলমেলে এই অবস্থায় সুগতবাবু দেখছি পশ্চিমবঙ্গ দিবস বিষয়টিকে গুলিয়ে দেবার জন্য এক কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি যেমন করে থাকেন আর কি, এক্ষেত্রেও তাই করেছেন। তিনি তাঁর দুই পূর্বজ, পিতৃব্যদ্বয়, শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুকে টেনে এনেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর পিতামহ শরৎচন্দ্র বসু ‘United Bengal within United India’ দাবি করেছিলেন। কথাটা সর্বৈব মিথ্যে। শরৎ বসু ও অন্যরা কখনও ভারতের মধ্যেই অখণ্ড বঙ্গ দাবি করেননি, তাঁরা ‘স্বাধীন, সার্বভৌম অখণ্ড বঙ্গ’ দাবি করেছিলেন। আর দাবিটা প্রথম শরৎ বসু করেননি, এই দাবি প্রথম করেছিলেন মুসলিম লিগ নেতা, কলকাতা মহাদাঙ্গার কুখ্যাত নায়ক হাসান শাহিদ সোহরাওয়ারদী ১৯৪৭ সালে দিল্লিতে; ২৭ এপ্রিল এক প্রেস কনফারেন্সে ‘স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ড বঙ্গের’ পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন তিনি।

পরদিন ২৮ এপ্রিল The Statesman এবং মুসলিম লিগের মুখপাত্র The Star of India পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেখানে ‘an independent, undivided and sovereign Bengal in a divided India as a separate dominion’ এর কথা বলা হয়। ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের রচনায়ও ‘আলাদা দেশের’ কথাই বলা হয়েছে। অন্যান্য আরও অনেক আকর গ্রন্থে এই তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। ড. সুগত বসু কোথায় এই ‘United Bengal within united India’ পেলেন জানি না। নাকি বিদেশে পড়াশোনা করা ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদেরা দেশের ইতিহাস ও অর্থনীতি পড়ার সময়ই পান না! নাকি ঠাকুরদা শরৎচন্দ্র বসুকে পাকিস্তানের ‘প্রক্সি’ প্ল্যান গলাধঃকরণ করার দায় থেকে মুক্তি দিতেই এই ঐতিহাসিক মিথ্যাচার? আসলে ১৯৪৬-এ কলকাতার সেই ভয়াবহ দাঙ্গার পরে বাঙ্গলার হিন্দুরা সোহরাওয়ারদীকে হিন্দু হত্যাকারী ‘কসাই’ হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল। হিন্দুদের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি কিছুটা হলেও শোধরানোর চেষ্টাও হয়তো তাঁর মনে কাজ করেছে।

সুতরাং একটা নতুন কিছু করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বাস্তবে তিনি অখণ্ড বাঙ্গলার নামে সম্পূর্ণ বাঙ্গলাটাই পাকিস্তানে ঢোকানোর ফন্দি এঁটেছিলেন তাঁর এই প্রস্তাবের মাধ্যমে। আর এই ভাবনা তিনি শুরু করেছিলেন ব্রিটিশ শ্রমিক দলের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলির ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতা ও ভারত ত্যাগ সম্পর্কিত ঘোষণার সময় থেকেই। এটা নিশ্চিতরূপেই ছিল পাকিস্তানের ‘প্রক্সি প্লান’, যাতে কোনোভাবে অখণ্ড বাঙ্গলা গঠিত হলে পরবর্তী সময়ে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পুরো বাঙ্গলাই পাকিস্তানে অংশীভূত করা যায়। আসলে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি শরৎ বসু ও অন্যান্য অখণ্ড বাঙ্গলার সমর্থক হিন্দু নেতাদের জানা ছিল না। তাঁরা নেহাতই ভাবাবেগের বশে সোহরাওয়ারদীর পাতা এই অখণ্ড বাঙ্গলার

প্রবাসী ইতিহাসবিদ ড. সুগত বসু কি একা পারবেন এই ঐতিহাসিক সত্যকে আড়াল করে তাঁর ঠাকুরদা শরৎচন্দ্র বসুকে মহীয়ান করে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের অবদানকে খাটো করতে এবং ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবসকে নস্যাৎ করতে?

ফাঁদে পা দেন। ইতিহাস, যুক্তি ও তথ্য যদি তাঁরা একটুও বিশ্লেষণ করতেন তাহলে তাঁদের সোহরাওয়ার্দীর পাতা এই ফাঁদে পা দেবার কথা নয়। কারণ মুসলিম লিগ ও তাঁর নেতা সোহরাওয়ারদীর এটা দীর্ঘ ভাবনাচিন্তার ফল।

কারণ দিল্লিতে সোহরাওয়ারদীর এই ঘোষণার মাত্রই দুদিনের মধ্যে বাঙ্গলা মুসলিম লিগের তথাকথিত বামপন্থী সম্পাদক আবুল হাশিম ২৯ এপ্রিল সোহরাওয়ারদীর এই 'স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ড বাঙ্গলার' প্রস্তাবকে সমর্থন করে এক বিবৃতি প্রকাশ করে বিদেশি এবং তাঁদের সহযোগী ভারতীয় শিল্পপতিদের বাঙ্গলাকে বিভক্ত করার আন্দোলনের জন্য দায়ী করেন। ঐতিহাসিক লিওনার্ড এ গর্ডন সোহরাওয়ারদীর এই প্রস্তাবকে 'স্বচ্ছ' নয় বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, 'Suhrawardy's motives are unclear.' আবার মুসলিম লিগের ছাত্রনেতা আব্দুর রহিম চৌধুরীর মতে, He (Suhrawardy) was totally commited to the Muslim cause.' এর মর্মার্থ বোঝার অসুবিধে হবার কথা নয় কারো। অন্যদিকে এই ঘটনার অনেক আগেই, ১৯৪৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সম্পাদক আবুল হাশিম তাঁর পরিকল্পিত 'ড্রাফট ম্যানিফেস্টোতে' Free State of Eastern Pakistan গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এমনকী সোহরাওয়ারদী বিধানসভায় কলকাতা দাঙ্গার বিষয়ে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেন, 'Bengal one day shall be an independent sovereign state'. বাংলাদেশি ঐতিহসিক হারুন-অল-রশিদ তাঁর 'দি ফোরশ্যাডোয়িং অব বাংলাদেশ' গ্রন্থে বলেছেন, সোহরাওয়ারদী ও আবুল হাশিম মুসলিম লিগের পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। ভাবলে ভুল হবে, বাস্তবে তাঁরা ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ীই কাজ করছেন। এমনকী পাকিস্তান আন্দোলনের জনক মহম্মদ আলি জিন্নাহও শেষ অবধি সোহরাওয়ারদীর এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অখণ্ড বাঙ্গলা একসময়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবেই। তাঁর মতে, 'with its Muslim majority, an independent Bengal would be a sort of sudsidiary Pakistan.' উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে পরিষ্কার যে, সরাসরি না হলেও সোহরাওয়ারদী অ্যান্ড কোং সমগ্র বাঙ্গলাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এক কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। আর শরৎচন্দ্র বসুর মতো একজন ঝানু রাজনীতিবিদ মুসলিম লিগের প্রক্সি পকিস্তান প্লান হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না একথা ভাবতে কষ্ট হয়। দেখা যাচ্ছে, শরৎ বসুর এই পর্বত-প্রমাণ ভুল ও অবিমৃশ্যকারীতার বৈধতা দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন সুগত বসু। অবশ্য বাংলাদেশের গবেষক আলতাফ হোসেনের মতে, 'The principal authors and supporters of the proposal were Suhrawardy who has no past and Sarat Chandra Bose who has no future and as such their wars will not sell.' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এবার আসি দ্বিতীয় প্রসঙ্গে। সুগতবাবু বলেছেন, আইন সভার বেশিরভাগ সদস্যই কংগ্রেসী ছিলেন, সুতরাং তাঁরাই ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ গঠনের জন্য প্রস্তাবটিকে পাশ করিয়ে (৫৮-২১ ভোটে) পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন, এমনকী কম্যুনিস্ট সদস্যরাও। সুগতবাবু ইতিহাসের অধ্যাপক, কিন্তু মনে হয় উনি বাঙ্গলার ইতিহাসটাই ঠিকমতো জানেন না। তাঁর জানা উচিত, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের সেই মহাদাঙ্গার পরেই মুসলমান নৃশংসতা ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে বাঙ্গলার হিন্দুদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি পৃথক হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য গঠনের চিন্তা-ভাবনা মাথায় আসে। হিন্দু মহাসভা ও তাঁর নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বাঙ্গলার হিন্দু জনগণের জন্য পৃথক রাজ্য গঠনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। শ্যামাপ্রসাদ একসময় সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসুর কাছে লিগ শাসনে হিন্দুদের দুর্দশা দূরীকরণে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁরা সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত হবার ভয়ে তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দেননি। তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ফলে ড. শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভাকেই এগিয়ে আসতে হয় 'হিন্দু হোমল্যান্ড' গঠনের আন্দোলনে। তিনি তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব ও বাঙ্গলার বুদ্ধিজীবীদেরও 'হিন্দু হোমল্যান্ড' আন্দোলনের স্বপক্ষে রাজি করান। তাঁর প্রচেষ্টায় একই সময়ে তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে হিন্দু হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং একই সময়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনে ড. বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায়েদের প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এমনকী কংগ্রেসের ওই সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদকেও আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তিনি উপস্থিতও ছিলেন। মূলত তাঁরই নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভার এই হিন্দু হোমল্যান্ড আন্দোলনে বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতৃত্বও শামিল হয়। আইনসভায় কংগ্রেসের আদৌ কোনো সক্রিয় কার্যকর ভূমিকা ছিল না। শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন বাঙ্গলার হিন্দু জনগণের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়; বাঙ্গলার সমস্ত প্রতিথযশা বুদ্ধিজীবী-সহ সমস্ত হিন্দু সংগঠন এই আন্দোলনের স্বপক্ষে এগিয়ে আসে। পশ্চিমবঙ্গ গঠনে ড. শ্যামাপ্রসাদের অবদান সমস্ত ঐতিহাসিকরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। আন্দোলনকে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে খাটো করা মূর্খামি মাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী তাঁর The Partition of Bengal and Assam গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, 'What is, however, significant is the contribution of the Mahasabha in mobilising the disgruntled Hinu opinion for a specific goal that was possible.'

প্রবাসী ইতিহাসবিদ ড. সুগত বসু কি একা পারবেন এই ঐতিহাসিক সত্যকে আড়াল করে তাঁর ঠাকুরদা শরৎচন্দ্র বসুকে মহীয়ান করে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের অবদানকে খাটো করতে এবং ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবসকে নস্যাৎ করতে? □

পঞ্চতন্ত্রের গল্প

নবাঙ্কুর

এক মূর্খ চাল খেতে গেছিল

এক মূর্খ শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে এসেছে এই প্রথম। মনে তার মহা আনন্দ। সবার কাছে শুনেছে জামাই আদরের কথা। এবার সে নিজে সেই জামাই আদর ভোগ করতে পারবে। বেশ খুশি খুশি মনে শ্বশুর বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখে তার শাশুড়ি ভাত রান্নার জন্য চাল বের করছেন। বেশ ভালো সরু,সাদা ধবধবে চাল। দেখেই ওর খুব খেতে ইচ্ছে হলো।

শাশুড়ি চোখের আড়াল হতেই সে এক মুঠো চাল নিয়ে মুখে পুরে দিল। এমনই বেচারার পোড়া কপাল, ঠিক সে সময়ে শাশুড়ি চলে এলেন সেখানে।

জামাই পড়ল মহা ফাঁপরে। শাশুড়ির সামনে সে গিলতেও পারে না আবার ধরা পড়ার ভয়ে চালগুলো ফেলতেও পারে না। মাঝখান থেকে এক মুঠো চাল মুখে পোরায়, মুখটা রইল বেশ ফুলে।

শাশুড়ি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করতে এলেন, কি হলো তার। কি আর হলো! সে কিছুই বলতে পারে না। আসলে মুখটা খুললেই তো ধরা পড়ে যাবে। শাশুড়ি তখন ভয়ে ভিতরে গিয়ে তাড়াতাড়ি স্বামীকে ডেকে আনলেন।

শ্বশুর ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাইরে এসে দেখে ওই অবস্থা। কিছুই মাথায় ঢোকে না তারও। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বৈদ্যকে ডেকে আনেন।

বৈদ্যও বারবার জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে? জামাই যথারীতি চুপ। নাড়ি দেখেও কিছু বুঝতে পারে না। শেষে বৈদ্য মনে করে, তাহলে বোধহয় মুখে আব হয়েছে। বাইরে থেকে টিপে টিপে দেখতে শুরু করলেন তিনি। বৈদ্য যতই টেপে জামাই ধরা পড়ার লজ্জায় তত সিঁটিয়ে যায়।

বৈদ্য ভাবে এ বুঝি যন্ত্রণায় এভাবে সিঁটিয়ে যাচ্ছে। তিনি ভালোভাবে পরীক্ষা করার জন্য মুখ ফাঁক করলেন।

ব্যাস, সমস্ত চাল মুখ থেকে মাটিতে। নিমেষে গাল ফোলা সেরে গেল। গেলে কী হবে। জামাই তো লজ্জায় অধোবদন।

এদিকে যারা নতুন জামাই দেখতে হাজির হয়েছিল। তারা তো হেসে অস্থির। তার শ্বশুর-শাশুড়ি আর কী করেন। তারা তো আর হাসতে পারছেন না জামাইয়ের সামনে। কোনোমতে এদিক ওদিক করে তারা হাসি চাপতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। □

পঞ্চতন্ত্রের গল্প

নিজেই নিজের চিকিৎসক

একজন লোক ভীষণ বায়ু রোগে ভুগছিল। বহুদিন ধরে সে এটা-সেটা করে রোগ সারাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোনো ফল হলো না। শেষে রোগের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সে বৈদ্যর কাছে গেল।

বৈদ্য সব বৃত্তান্ত শুনে, তার হাতে একটা ওষুধ দিলেন। বললেন— তুমি বাড়ি গিয়ে এটাকে ভালো করে গুঁড়ো কর। দেখবে যেন খুব মিহি হয়। আমি ততক্ষণে আসছি।

লোকটা তো বৈদ্যের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে বাড়ি এল। এসে ভালো করে ওষুধটা গুঁড়ো করল। অপেক্ষা করতে লাগল কখন বৈদ্য আসবে।

কিন্তু বৈদ্য আর আসে না। সে অস্থির হয়ে ভাবল— ওষুধ তো আমার কাছেই আছে। তাহলে আর শুধু শুধু দেরি করব কেন? বৈদ্য আসছে না, আমি ওষুধটা এখনই খেয়ে ফেলি।

এই ভেবে সে গুঁড়ো ওষুধটা ভালো করে জলে গুলে খেয়ে ফেলল। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ল।

একটু পরেই বৈদ্য এসে অবাক হয়ে যায়। ভাবে, কী হলো এমন!

সব শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে বমির ওষুধ খাইয়ে বমি করালেন। তার পেট থেকে যা ছিল সব বের করাতে সে একটু সুস্থ বোধ করল।

মৃত্যুর মুখ থেকে লোকটিকে ফিরিয়ে এনে বৈদ্য তো তাকে খুব বকতে লাগলেন। তিনি বললেন— আমি কী তোমাকে এটা গুঁড়ো করে খাবার কথা বলেছিলাম? আমার আসা অবধি তুমি অপেক্ষা করতে পারলে না? এত তাড়া

তোমার? যদি আমার আসতে আর একটু দেরি হতো, তাহলে কী হতো বলতো? প্রাণটা তো বেঘোরে যেত, নাকি?

লোকটা আর কী বলে। সে কাঁচুমাচু মুখে বকুনি খায়। সে আসলে বুঝতেই পারেনি। এটা খেলে তার কোনো ক্ষতি হতে পারে।

বৈদ্য আবারও বলে— আরে বাবা, সব ওষুধের প্রয়োগের নিয়ম কী এক হয়? এটা আদৌ খাবার ওষুধ ছিল না। যাক্ গে, যা হবার তা হয়ে গেছে। আর কখনও যেন এমন কাজ করতে যেও না।

সুতরাং, সুফল হয় এমন কোনও কাজও যদি নিয়ম মেনে না করা হয়, তাহলে উলটো ফল হয়। তাই বুদ্ধিমান লোকেদের কখনও নিয়ম ভেঙ্গে কাজ করা উচিত নয়। এ রকম কাজ করলে নিজেরও বিপদ হতে পারে, আবার লোকেরও নিন্দার পাত্র হতে হয়।

জানো কি?

- ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয়েছে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি পেয়েছিলেন ১৮৪১ সালে।
- নয়া পয়সা মুদ্রা চালু হয় ১৯৫৭ সালে।
- ভারতের উচ্চতম রেল স্টেশন হলো ঘুম।
- নতুন রামমন্দিরের উচ্চতা ১৬১ ফুট।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

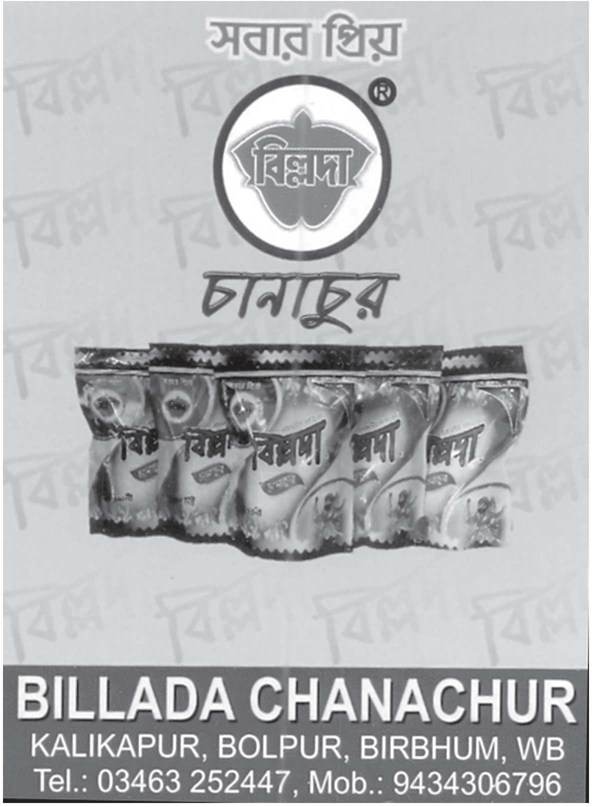

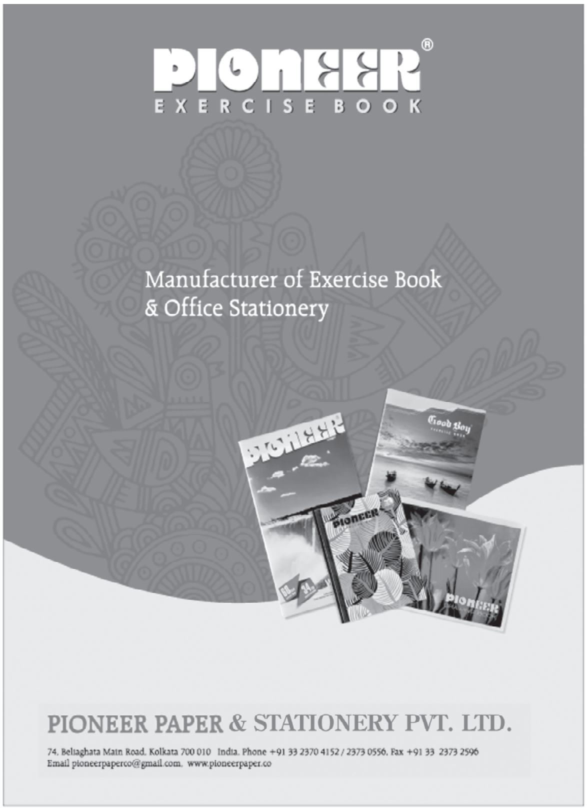

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ঐক্যের প্রতিমূর্তি ও অপারেশন পোলো

দুর্গাপদ ঘোষ

এ বছর অর্থাৎ ইংরেজি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৭তম জন্মবার্ষিকী। কেবল তাঁর একার নয়। বিশ্বের কথা বাদ দিলেও কেবল এই ভারতবর্ষেই দিনটা আরও অনেকের জন্মতিথি। তাঁদের মধ্যে এক-আধজন হয়তো আনুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে জনসমাজে সামান্য আলোকিত হয়েছেন। বেশিরভাগই থেকে গেছেন পাদপ্রদীপের তলায়। অন্যদিকে সর্দার প্যাটেল কেবল আলোকিত হয়েছেন তাই নয়, স্বমহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো। তাঁর সুমহান কীর্তির মধ্যে কৃষক আন্দোলনে প্রধান নেতৃত্ব ছাড়াও দৃঢ়চেতার প্রতিমূর্তিরূপে কিংবদন্তি 'লৌহমানব' হিসাবে। সারা দেশের মধ্যে 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্র বসু এবং 'ভারত কেশরী' ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছাড়া সমসাময়িক কালে প্যাটেলের মতো লৌহকঠিন ব্যক্তিত্ব চতুর্থ কাউকে আমাদের চোখে পড়ে না। অন্তরে স্থায়ীভাবে স্থান করে না। সার্বিক বিচারে যাকে বলে 'আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক', উল্লেখিত ত্রয়ী ছাড়া আর কাউকে সেইভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখি না। এই তিনজনেরই দেশসেবা, দেশের ঐক্য এবং দেশ পুনর্গঠনে আরও নানা রকম উল্লেখযোগ্য চিন্তাভাবনা তথা প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেল— এই নামে যে বিভূতির প্রতিমূর্তি ভাস্বর হয়ে ওঠে তাহলো ভারতের ভৌগোলিক এবং জাতীয়তাবাদের ঐক্য।

স্ট্যাচু কিংবা মূর্তি বললে আমরা সাধারণত কোথাও স্থাপিত কারও জড় প্রতিমূর্তিকেই বুঝি। এই প্রেক্ষিতে ইতিহাসের সামান্য পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে প্যাটেল ছিলেন ঐক্য ও একতার একজন সচল প্রতিমূর্তি— A living Statue of Unity। সাংস্কৃতিক দিক থেকে বহু প্রাচীনকাল থেকেই 'উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণং বর্ষং তৎ ভারতং নামঃ' দেশটি এক তথা একাত্মতাবদ্ধ ছিল এবং আছে। যাকে বলে one nation that is the concept of one Culture— এক সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র, সেটা অখণ্ডভাবেই প্রবহমান। এবং সেটাই হলো 'কুছ বাত হ্যায় অ্যায়সি কী অস্তি মিটতি নহী হমারী।'

কিন্তু কালের প্রভাবে খণ্ড-ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ক্ষমতাকেন্দ্রিক শাসনতন্ত্রে। গুজরাটের সর্দার সরোবরে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী প্যাটেলের গগনচুম্বি যে 'Statue of Unity' বা ঐক্যের প্রতিমূর্তি উপহার দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রতীকি। কিন্তু ওই প্রতীকের প্রেক্ষাপটে বাস্তব জীবনে সর্দার প্যাটেল যে লৌহকঠিন দৃঢ়তার সাক্ষর রেখে গেছেন তার জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। রাজনৈতিক শাসনের গণ্ডিতে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়া ভারতকে তিনি যেভাবে ঐক্যবদ্ধ ভারত, এক ভারত রাষ্ট্র নির্মাণ করে গেছেন তাঁকে আবারো একবার স্বাগত জানিয়ে স্মরণ করা হয়েছে গত ১৭ সেপ্টেম্বর। ১৯৪৮ সালের এই দিনে হায়দরাবাদের প্রবল প্রতাপশালী নিজাম স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। অর্থাৎ এ বছর হায়দরাবাদের নিঃশর্ত ভারতভুক্তির ৭৫তম পূর্তি বর্ষ।

ব্যাপারটা নিতান্ত এয়ারগান দিয়ে নিরীহ পাখি মারার মতো ছিল না। একটা বিরাট বড়ো এলাকা, বিশাল ধনসম্পদ এবং নিজস্ব সেনাবাহিনী ছাড়াও হায়দরাবাদের সর্বশেষ নিজাম স্যার মীর ওসমান আলি খান সিদ্দিকি আসাফ জাহ-কে সমস্ত রকমভাবে সমর্থন, সহযোগিতা ও প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিল কাসিম রিজভির নেতৃত্বাধীন ইতিহাস-উল-মুসলিমিন নামের সংস্থা এবং তাদের আধাসামরিক বাহিনী 'রাজাকার'। যারা এখনো ঘোরতর ভারত এবং হিন্দু-বিদ্বেষী। উল্লেখ্য, এই রাজাকার বাহিনীর সহযোগিতায় আব্দুল ওয়াহিদ ওবেইসি অল ইন্ডিয়া মুত্তাহিদ-ই-মুসলিমিন (এ আই এম আই) নামের রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের বর্তমান সর্বেসর্বা ও হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদ-উদ্দিন ওবেইসি'র পিতা সালাউদ্দিন ওবেইসি ১৯৭৫ সালে এর সভাপতি হন।

ঐক্যবদ্ধ ভারত রাষ্ট্রের পথে প্যাটেলকে আরও অনেক প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয়েছিল। হায়দরাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যাওয়ার পিছনে আরও যে সমস্ত বাধা ছিল তার মধ্যে একটা হলো ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁর সরকারের প্রবল অনিচ্ছা। পাশাপাশি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (তখন সিপিএম ইত্যাদি ছিল না)-র তীব্র বিরোধিতা। আর এই সমস্ত ঐক্যবদ্ধ ভারত বিরোধীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পাকিস্তানের জনক মহম্মদ আলি জিন্নার এক প্রকাশ্য বিবৃতি তথা হুমকি। দেশভাগের ঠিক প্রাক্কালে স্বাধীন ভারতে হায়দরাবাদের ভারতভুক্তির প্রসঙ্গ যখন ওঠে তখন, ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে জিন্না এই বলে হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন 'হায়দরাবাদের গায়ে নখের আঁচড় পড়লে সমস্ত মুসলমান এককাট্টা হয়ে নিজামের রাজত্ব বাঁচাতে জীবন দেবে।' বলা বাহুল্য, ইঙ্গিতটা ছিল ১৯৪৬ সালে কলকাতা এবং নোয়াখালি-সহ অবিভক্ত বাঙ্গলায় 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর মতো নির্বিচারে হিন্দু হত্যা। রাজনৈতিক দল হিসেবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভার হায়দরাবাদ এলাকার নেতা-কর্মীরা ছাড়া তখন সর্দার প্যাটেলের পাশে বস্তুত আর কেউ ছিল না। দেশ-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এখন যেমন যে কোনো ইস্যুতে জোট বাধে, মহাজোট করে তখনো তেমনি হায়দরাবাদে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা রাজাকারদের সঙ্গে অঘোষিত জোট

ফঃ ৬

বেঁধেছিল ৮৫ শতাংশ হিন্দু অধ্যুষিত হায়দরাবাদের ভারত ভুক্তির বিরুদ্ধে। এদিক থেকে দেখলে প্যাটেলকে প্রায় একা কুম্ভ হয়ে অভিযান চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে মাঠে নামতে হয়েছিল।

নিজামের নিজের সেনা সংখ্যা ছিল প্রায় ২৪ হাজার। তার ওপর রাজাকার বাহিনী যাদের বেশিরভাগ সাধারণ পোশাকে সমাজের মধ্যে থেকে দাঙ্গা করে যাচ্ছিল। হিন্দু নিধনে অন্যদের প্ররোচিত করছিল। বস্তুত তারা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অন্তর্ঘাতক বাহিনী। তিন-তিনটে রাজনৈতিক দলের প্রচ্ছন্ন সমর্থন মদত পেয়ে রাজাকাররা উর্দিপরা সেনাবাহিনীর চাইতেও অনেক বেশি উগ্র ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তার ফলে প্যাটেলকে লড়তে হয়েছিল যাকে বলে ঘরে বাইরে শত্রুর সঙ্গে। সদ্য স্বাধীন ভারতের আর্থিক সঙ্গতি তখন তেমন ভালো ছিল না। অন্যদিকে নিজামের ভাণ্ডারে এখন থেকে ৭৫ বছর আগে অর্থের পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি ডলার। এখনকার হিসেবে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা। যেটা সে সময়কার হিসাবে এককথায় বিপুল বলা যায়।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন আগে থেকেই ঘোরতর সাম্প্রদায়িক মানসিকতার রাজাকাররা হায়দরাবাদ জুড়ে হিন্দু হত্যায় নেমেছিল। স্বাধীনতার পর নিজাম ভারতভুক্ত হবেন না এই বার্তা চাউর হতে তাঁর আর্থিক এবং অস্ত্রের মদতে আরও অনেক বেশি মাত্রায় বেপরোয়া হয়ে গড়ে রোজ ৭০ জন হিন্দুকে হত্যা করে যেতে থাকে। ওইসব হিংস্র রাজাকারদের হাত থেকে হিন্দুদের প্রাণরক্ষা এবং তাঁর নীতিগত সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য প্যাটেল প্রায় সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁর আহ্বানে তখন প্রায় ৫৬৫টি খণ্ডরাজ্য এবং মুসলমান শাসিত রিয়াতের অধিকাংশ ভারতভুক্ত হতে রাজি হলেও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বেঁকে বসেন হায়দরাবাদের নিজাম। স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন আগে, সে বছরের জুলাই মাসে ভারতের তৎকালীন বিদেশ সচিব ভিপি মেননের মাধ্যমে সর্দার প্যাটেল নিজামের কাছে বার্তা পাঠান। কিন্তু মেনন কার্যত প্রত্যাখ্যাত হন। এতে যারপর নাই ক্ষুব্ধ হয়ে প্যাটেল তখনই বলে রেখেছিলেন, '...the only alternative to co-operation is anarchy and caos.' বলেছিলেন, যারা স্বাধীন ভারতে যুক্ত হবার বিরুদ্ধে যাবে তাদের সম্পর্কে কী ব্যবস্থা নিতে হবে তা আসন্ন স্বাধীন ভারত জানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে তখন এটা প্রায় ঠিকই ছিল যে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন সর্দার প্যাটেলই। বিশেষ করে নিজাম শাসিত হায়দরাবাদের মতো একটা এলাকা যা বাকী ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সম্পর্ক ও একাত্মতার ক্ষেত্রে একটা অতি কৌশলগত দিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হায়দরাবাদকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত না করানো হলে তা এদেশের পেটের মধ্যে 'ক্যানসারের মতো' হয়ে থাকবে বলেও মত প্রকাশ করেছিলেন তিনি। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের কাছে হায়দরাবাদের ভারতভুক্তি যে কতখানি অনিবার্য তা অনুধাবন করে নেহরুর অনাগ্রহ ও অনিচ্ছা উপেক্ষা করে প্যাটেল তাই নিজামের সঙ্গে আলোচনার জন্য দফায় দফায় প্রতিনিধি পাঠাতে থাকেন। চেয়েছিলেন, বিনা রক্তপাতে, বিনা বলপ্রয়োগে ব্যাপারটা যদি ভালোয় ভালোয় মিটে যায়। কিন্তু দেখা গেল নিজামের মানসিকতা ঠিক যেন পাকিস্তানের মতো। সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণে ভারতের কোনো কথাই যেমন পাকিস্তানি শাসকদের চামড়া স্পর্শ করে না তেমনি কোনো আলোচনাতেই নিজামকে নিমরাজিটুকুও করানো যায়নি। ফলে শেষ পর্যন্ত প্যাটেলকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে, 'A Police action would be justified?

প্রসঙ্গত প্যাটেল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা থেকে তিনি যে এক চুলও সরে আসবেন না এটা বুঝতে পেরেছিলেন ভারতে শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড লুইস মাউন্টব্যাটেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারত ছেড়ে চলে যাবার আগে তিনি পর্যন্ত নিজামকে ভারতভুক্ত হবার অনুরোধ করেন। কিন্তু নিজাম ছিলেন নিজামেই। মাউন্টব্যাটেন ভারত ত্যাগ করার পর পরই প্যাটেল হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাঁর সেই সিদ্ধান্তের কথা প্রধানমন্ত্রী নেহরু তো বটেই, কাকপক্ষীকেও জানতে দেননি।

সে বছরের সেপ্টেম্বরের ৭-৮ তারিখে রেল কোম্পানির তরফে ঘোষণা করা হয় যে ভারতের পূর্ব উপকূল তথা পূর্বঘাট পর্বতমালা ঘেঁষে দক্ষিণ ভারতে যাতায়াতকারী যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল ক'দিনের জন্য বন্ধ থাকবে। চলবে কেবল পণ্যবাহী ট্রেন বা মালগাড়ি। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল নামমাত্র। প্রত্যক্ষদর্শীরা ছাড়া অন্য কেউ বস্তুত বুঝতেই পারেননি যে ওইসব মালগাড়িতে যাচ্ছে ভারতীয় সেনা এবং অস্ত্রশস্ত্র। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় সেনা পাঠানোর কাজ। অভিযানের সাংকেতিক (code) নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন পোলো।' যতদূর জানা যায় নেহরুকে কিছু না জানিয়েই এই অভিযান শুরু করেন তাঁরই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ভারতীয় সেনারা ১১ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদে গিয়ে উপস্থিত হতেই নিজামের সেনাবাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যতটা না তারা তার চাইতে অনেক বেশি মাত্রায় মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসে রাজাকাররা। সেই সঙ্গে হায়দরাবাদ জুড়ে শুরু করা হয় ব্যাপকভাবে হিন্দু নিধন দাঙ্গা। প্রচুর সংখ্যক মালগাড়িতে ভারতীয় সেনা এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র আসছে এরকম একটা খবর ছড়িয়ে পড়ার পর নিজামের উর্দিধারীরা মোকাবিলায় নামতে যখন দ্বিধা করছে অন্যদিকে রাজাকার বাহিনী তখন শহরে, গ্রামে, গঞ্জে সর্বত্র দানবের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। খুন-জখম, রক্তপাত, গৃহদাহ, হিন্দুনারী হরণ এবং পাশবিক নির্যাতনের মাত্রা আকাশছোঁয়া করে তোলে। ধারালো অস্ত্র হাতে জঙ্গিপনা শুরু করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। ঐতিহাসিকরা যেভাবে তার বিবরণ উপস্থাপিত করেছেন এক কথায় তা বীভৎস। যেটুকু পরিসংখ্যান প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে হতাহতের সঠিক সংখ্যা কারো পক্ষেই নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। মোটামুটি যা পাওয়া যায় তাতে ১১ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর, এক সপ্তাহের মধ্যে ওই সংঘাতে ৪২ জন ভারতীয় সেনা শহীদ হন। খতম হয় ২ হাজারেরও বেশি রাজাকার। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হন অন্ততপক্ষে ৩০ হাজার জন। কারো কারো মতে সংখ্যাটা প্রায় ২ লক্ষের কাছাকাছি। সর্দার প্যাটেলের মস্তিষ্কপ্রসূত 'অপারেশন পোলো'-য় পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে নিজামকে শেষ পর্যন্ত ১৭ সেপ্টেম্বর নতজানু হয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে বাধ্য হতে হয়। পরদিনই অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদকে সরকারিভাবে ভারতভুক্ত ঘোষণা করে বাতিল করা হয় অপারেশন পোলো। নিজাম পাততাড়ি গুটিয়ে তাঁর কিছু বেগম এবং পোষা কুকুরদের নিয়ে চলে যান পাকিস্তানে। পাকিস্তানে চলে যান কাসিম রিজভি-ও। কিন্তু তার আগে নিজাম নিজেই রাজাকার বাহিনীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কেবল তাই নয়। তাঁর এই পরিণতির জন্য তিনি রাজাকারদেরই দায়ী করেন। বলেন যে রাজাকাররাই হায়দরাবাদের ভারতভুক্তির বিরোধিতা করে তাঁকে পৃথক এবং স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত নিতে চাপ দিয়ে বাধ্য করেছিল। রাজাকারদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে তিনি তাদের সমস্ত রকমের মদত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন বলেও স্বীকার করেন। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল কীভাবে এবং ঠিক কতখানি বাঁকাতে হয় তা খুব ভালোই জানতেন 'ঐক্যের প্রতিমূর্তি'-র জীবন্ত নায়ক। □

বাংলাদেশে ফের দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর, সরব হিন্দুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দুর্গাপুজো এবং ভোটমুখী বাংলাদেশে একের পর এক প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে। এই ঘটনায় তীব্র নিন্দায় সরব হয়েছে বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা। ঢাকা থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরের টাঙ্গাইলের বেল দুয়ারে প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। আতিয়া ইউনিয়নের হিংগানগর কামান্না সরকার পাড়ার মন্দির শুক্রবার এই ঘটনাটি ঘটে। মন্দির কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় বাসিন্দা পরিমল দে বলেন, দুর্গাপুজো উপলক্ষে আমাদের মন্দিরের প্রতিমা তৈরির কাজ চলছিল, শনিবার দেখতে পাই মন্দিরের ভিতরে থাকা গণেশ, সরস্বতী, অসুর-সহ কয়েকটি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। কে বা কারা এই কাজ করলো তা জানা যায়নি। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা। সংগঠনের সভাপতি উষাতণ তালুকদার, ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক ও নির্মল রোজারিও এবং সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত জানান, প্রতিবছর দুর্গাপুজোর প্রস্তুতির সময় প্রতিমা ভাঙার ঘটনা ঘটে। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার কোনে বিচার কিংবা প্রতিরোধ করার জন্য পদক্ষেপ হচ্ছে না। ফরিদপুরের ওই একই মন্দিরে ২০২১ সালেও একই ঘটনা ঘটেছিল। দুর্গা পুজোর প্রস্তুতির সময় প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছিল। দিদার নামে এক দুষ্কৃতি সেই সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। কিন্তু তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে দাবি করে ১৫ দিনের মধ্যে ছেড়েও দেওয়া হয়। সেই সময় ওই দুষ্কৃতিকে যথাযথ শাস্তি দিলে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো না। এই মন্দির পরিদর্শন করেছেন ফরিদপুর জেলার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা।

হবিগঞ্জ, মাধবপুর ছাতিয়াইন, দক্ষিণ রামেশ্বর গ্রামের পুজো মণ্ডপেও হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় হিন্দু ছাত্র মহাজোট। জাতীয় প্রেসক্লাবে তারা এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

কানাডাকে বড়ো ধাক্কা! ভিসা পরিষেবা বন্ধ করার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কানাডার নাগরিকদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করলো ভারত। অনির্দিষ্টকালের জন্য এই পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে। খালিস্তানি জঙ্গি নেতা খুনের ঘটনায় চাপাউতরের মধ্যে কানাডাকে জোর ধাক্কা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। অন্যদিকে দেশ থেকে কানাডার কূটনৈতিক আধিকারিকদের সংখ্যা কমানোর পক্ষে সওয়াল করেছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর পরোক্ষভাবে বলেছেন যে রাজনৈতিক সুবিধা দিয়ে কোনোরকম সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা বা হিংসাকে প্রতিহত করা যায় না। ওটাওয়া (ottawa) দোষারোপ করেছে যে কানাডার শিখ সন্ত্রাসবাদী হরদিপ সিং নিজ্জরের হত্যার পিছনে ভারতের হাত আছে। বিদেশমন্ত্রী সোজা কথায় বলেছেন, অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো— ভারত এই মতের বিরোধী।

কয়েকদিন আগে থেকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। কানাডার নাগরিক খালিস্থানি জঙ্গি নেতা হরদীপ সিংহ নিজ্জর খুনের পর পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেন, এর পেছনে ভারতের হাত রয়েছে। তারপরেই কানাডা থেকে বহিষ্কার করা হয় সে দেশের

ভারতের গোয়েন্দা প্রধানকে। এমনকী আমেরিকা-সহ বেশ কয়েকটি বন্ধু দেশের কাছে ভারতের নিন্দার করার আবেদন জানায় কানাডা। ট্রুডোর এই অভিযোগকে অবান্তর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। ভারতে নিযুক্ত কানাডার এক শীর্ষ কূটনীতিককেও দেশ থেকে চলে যেতে বলা হয়। দু' দেশেই নিজেদের নাগরিকদের জন্য নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। বুধবার নরেন্দ্র মোদী ও বিদেশমন্ত্রী জয় শংকর বৈঠকে বসেন। তারপরেই বৃহস্পতিবার জানা যায়, ভারতে কানাডা নাগরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জানা গেছে, আপাতত বন্ধ থাকবে ভিসা দেওয়ার পরিষেবা।

এর পর বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেন, ইতিমধ্যে যাদের ভিসা রয়েছে তারা ভারতে আসতে পারবেন, কিন্তু নতুন করে ভিসা দেওয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। কূটনৈতিকদের প্রসঙ্গে বলেন, বিদেশি কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে ভারত। আশা করা হচ্ছে কানাডায় থাকা ভারতের কূটনীতিকদের প্রতিও একই আচরণ করবে সে দেশের প্রশাসন।

কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয় পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, ইতিমধ্যেই তাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করা হচ্ছে। কোনো সমস্যায় পড়লে তারা ভারতীয় দূতাবাসের যোগাযোগ করতে পারেন। একই সঙ্গে কূটনীতিকদের সংখ্যা কমানোর বার্তা দিতে গিয়ে বাগচী বলেন, কানাডায় ভারতীয় হাই কমিশনের যত জন কূটনীতিক রয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি কূটনীতিক রয়েছেন ভারতে কানাডার হাইকমিশনে। আশা করি, এবার সেই সংখ্যা কমানোর কথা ভাববে কানাডার প্রশাসন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, কানাডার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে ভারত। আন্তর্জাতিক মহলে সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তাঞ্চল হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠছে কানাডা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান নিয়ে কানাডার চিন্তিত হওয়া উচিত।

মদ বিক্রিতে পশ্চিমবঙ্গকে মডেল করছে কর্ণাটক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাজ্যের আয় বাড়াতে শতাধিক মদের দোকানের লাইসেন্স দিতে চলেছে কর্ণাটক সরকার। রাজ্যের আবগারি মন্ত্রক রাজস্ব বাড়ানোর জন্য এ বাবদ একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছে। জেডিএস দলের নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী সরকারের এই প্রয়াসকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেছেন, মদ্য ভাগ্য (Madya Bhagya) । তিনি আরও বলেন, একদিকে সরকার নারী শক্তি উন্নয়নের কথা বলছে, অন্যদিকে গ্রামের শান্ত জীবনকে ব্যাহত করার জন্য ব্যাপক হারে মদের দোকান খোলার অনুমতি দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ জুলাইয়ের রাজ্য সরকারের বাজেটে ৩৬,০০০ কোটি টাকা মদ (নিকার ও বিয়ার) বিক্রি করে অতিরিক্ত আয় বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল। রাজ্যের আবগারি দপ্তর ইতিমধ্যেই এবাবদ ২৯,৯২০ কোটি টাকা আয় করেছে। এখন লক্ষ্য পূরণের জন্য আরও মদ বিক্রি কার দোকান খোলার লাইসেন্স দিতে চলেছে।

রাজ্যের আয় বাড়াতে কর্ণাটকের কংগ্রেসী সরকার যে পশ্চিমবঙ্গকে 'মডেল' হিসেবে অনুসরণ করতে চাইছে, তা বলাই বাহুল্য।

শ্রীরাম স্তম্ভ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ এই যে 'অযোধ্যা থেকে রামেশ্বরম' যাওয়ার পথে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যে যে স্থানে গমন করেছেন, এই রকম ২৯০টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এইসব স্থানগুলিতে 'শ্রীরাম স্তম্ভ' বসানো হবে, যার উপরে আমাদের ধর্ম ও ইতিহাসের বর্ণনা থাকবে। এটি একটি উত্তম সিদ্ধান্ত, ওই সমস্ত স্থানে শ্রীরাম স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হলে স্থানের গৌরব বৃদ্ধি করা হবে। রামমন্দিরে যে গোলাপী রঙের পাথর বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে তা দিয়েই এই স্তম্ভগুলি বানানো হবে। প্রথম স্তম্ভটি ২৭ সেপ্টেম্বর অযোধ্যায় আনা হচ্ছে। এই স্তম্ভটি মণিপর্বতে স্থাপন করা হবে। অযোধ্যা থেকে রামেশ্বরম্ পর্যন্ত শ্রীরামের পদচিহ্নযুক্ত স্থানগুলি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। যেখানে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা হবে সেখানে ওই স্থানের সম্পর্কিত রামায়ণের অংশবিশেষ স্তম্ভে লেখা থাকবে।

শ্লোকগুলি সংস্কৃত ভাষাতে এবং শ্লোকের ভাবার্থ স্থানীয় ভাষাতে লেখা থাকবে যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। এইভাবে সমস্ত স্তম্ভে স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণ বর্ণনা করা থাকবে।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের ভগবান বলরাম জয়ন্তী উৎসব উদযাপন

মালদহ জেলার পুরাতন মালদহ থানার আট মাইলের গুণগাও গ্রামে সাড়ম্বরে পালিত হলো ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের ভগবান বলরাম জয়ন্তী উৎসব। এই দিনের উৎসবে কিষাণ সঙ্ঘের পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস। প্রধান বক্তা হিসেবে ভাষণ দেন সংস্কার ভারতীর মালদহ জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার। এই উৎসবে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের সহ-সম্পাদক পঞ্চু রাজবংশী, সঙ্ঘের মালদহ বিভাগের গ্রাম বিকাশ সংযোজক তপন সরকার, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহজেলা সম্পাদক মণ্টু সরকার প্রমুখ। এই উৎসব পালিত হলো ভাদ্র শুক্লা ষষ্ঠী ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার।

প্রধান বক্তা শ্রীসরকার ভগবান বলরাম কেন লাঙ্গল কাধে তুলে নিলেন তার ব্যাখ্যা করে কিষাণ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য আদর্শের কথা বলেন। কৃষকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও ফসলের লাভজনক দাম কীভাবে চাষিরা পাবেন এবং জৈবিক সারের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সব শেষে কিষাণ সঙ্ঘের সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আগামী কলকাতা অভিযান বিষয়ে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জৈবিক প্রমুখ পার্থ চক্রবর্তী। গ্রামের উপস্থিত সকল কৃষক ভাইরা এই নতুন উৎসব আনন্দের সঙ্গে ভালো সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে শৌর্য জাগরণ যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গোটা ভারত জুড়ে বিভিন্ন দেশ বিরোধী শক্তির কার্যকলাপ, লাভ-জেহাদ, ধর্মান্তরকরণ, আতঙ্কবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদির প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতভূমির মূল নিবাসীদের ওপর আক্রমণ নেমে আসছে। দেশবাসী তাদের পূর্বপুরুষের শৌর্য ও পরাক্রমের ইতিহাস ভুলতে বসেছে। রাষ্ট্রবিরোধী, ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী ও হিন্দু বিরোধী চক্রান্ত বেড়ে চলেছে। তাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দল দেশবাসীদের নিকট ভারতের গৌরবশালী ও পরাক্রমের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার জন্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে ও দেশ রক্ষার্থে অমর বলিদানীদের স্মরণে 'শৌর্য জাগরণ যাত্রা'-র আয়োজন করেছে। এই রথযাত্রা দক্ষিণবঙ্গের চারটি স্থান থেকে ও উত্তরবঙ্গের দুটি স্থান থেকে মোট ছয়টি রথ যাত্রা শুরু করছে ১লা অক্টোবর, ২০২৩। বিভিন্ন জেলা পরিক্রমা করে ৮ অক্টোবর কলকাতার রাণী রাসমণি রোডে ও শিলিগুড়ি শহরে সমাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

যাত্রার উদ্দেশ্য:

(১) যুবকদের ভারতের গৌরবশালী অতীত, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত করা।

(২) অতীতকাল থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বীরদের ইতিহাস তুলে ধরা।

(৩) সমস্ত নাগরিকদের দেশভক্ত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে উৎসাহিত করা, হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও রাষ্ট্রের প্রতি সমর্পণের ভাব জাগরণ। এই বঙ্গের বীরেরা যুগে যুগে ধর্মরক্ষা ও রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করেছেন। মধ্যযুগে রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা গণেশ ও অন্যান্য শৌর্যবান বাঙ্গালি রাজারা তুর্কি, আফগান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বঙ্গভূমিতে হিন্দুত্ববাদের জাগরণ ঘটাতে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অখণ্ড বঙ্গে শক্তিশালী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), পুলিনবিহারী দাশ, মাস্টারদা সূর্য সেন, মাতঙ্গিনী হাজরার মতো হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বলিদান ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খলকে ছিন্ন-ভিন্ন করেছিল। এই সকল বীরগাথা আজকের যুব সমাজের কাছে বিস্মৃত।

আজ দেশের ও পশ্চিমবঙ্গের সামনে এক সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে বাঙ্গালি হিন্দুদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হতে চলেছে। এমতাবস্থায়, দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজের উচিত পূর্বপুরুষদের শৌর্য ও বলিদানকে স্মরণ করা এবং রাষ্ট্র ও ধর্মকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করা। তাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের পক্ষ হতে বর্তমান যুব সমাজকে অমর বলিদানীদের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করা, তাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করা ও তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করার লক্ষ্যে এই কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়েছে। এই সম্মিলিত প্রয়াস পুনরায় ভারতকে গৌরবশালী ও সমৃদ্ধশালী করে তুলে, ভারতকে বিশ্ব গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে এই প্রত্যাশা সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই পোষণ করেন।

লাভ জেহাদ প্রতিরোধের ডাক সরসঙ্ঘচালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৪ সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌতে আওধ প্রান্তের (অযোধ্যা সঙ্ঘের সাংগঠনিক প্রান্ত) বৈঠকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত লাভ জেহাদ ও ধর্মান্তরকরণের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই সমস্যা নিরসনে তিনি সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে আলোচনাক্রমে তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলে ধর্মান্তরকরণের এই বিপদ ঘনীভূত হয়েছে যা গুরুতর উদ্বেগের কারণ। যে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে দেশ ও সমাজ বিরোধী শক্তি সক্রিয় সেই অঞ্চলগুলিতে কার্যকর্তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। দেশ জুড়ে ধর্মান্তরকরণের ঊর্ধ্বগতি জনিত সমস্যাটির সঙ্ঘের কর্মসূচীভুক্ত। উত্তরপ্রদেশের ভারত-নেপাল আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে হিন্দুদের জমি দখল করে অবৈধ মসজিদ, মাজার, দরগা তৈরি হওয়া, খ্রিস্টান মিশনারীদের অতিসক্রিয়তা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করে ল্যান্ড জেহাদ সম্পর্কেও সমাজে সচেতনতা প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন সরসঙ্ঘচালক। আওধ প্রান্তে সঙ্ঘ কাজের ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি ও প্রসারের ওপরে জোর দিয়ে হিন্দু সমাজের উন্নয়নের বিষয়েও তিনি আলোচনা করেন। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ যারা নিজেদের পেশার পাশাপাশি রাষ্ট্র নির্মাণেও সমর্পিত, তাদের কাছে সঙ্ঘের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তাদের পৌঁছে যাওয়া, বিভিন্ন সদর্থক কার্যক্রমে তাদের যোগদান সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অংশে সঙ্ঘের উপস্থিতি প্রমাণের ওপরেও মোহনজী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতের জাতীয়তাবাদ নিয়ে আলোচনা সভা

প্রবীর ভট্টাচার্য॥ জাতীয়তাবাদ এই শব্দের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পরিচিত বাঙ্গালিরাই। কারণ এই বঙ্গভূমিতেই বঙ্কিমচন্দ্র ‘জাতীয়তাবাদ’ শব্দের বর্ণনা করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র চন্দ্রনাথ বসুর বাঙ্গালির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে জাতীয়তাবাদে হিন্দুত্ব বিশ্লেষণটি জুড়েছেন।

গত ৯ আগস্ট সামাজিক সংগঠন ‘বাংলা আবার’, ‘মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্সটিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ’-এর সমবেত প্রয়াসে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক আবাসভূমির রামকৃষ্ণ মঞ্চে ‘স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় জাতীয়তাবাদ নানা রূপে, নানা দৃষ্টিতে’ শীর্ষক দু’দিনের মাঙ্গলিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয়তাবাদ নিয়ে স্বামীজীর ভাবনাকে চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে সেখানে আলোকপাত করা হয়। প্রথমত, বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় জাতীয়তাবাদী উপাদানের সন্ধান। দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দের দর্শনে স্বামীজীর অন্যতম ধারাভাষ্যকার, ভারতীয় বিপ্লবের কন্যা ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে স্বামীজীর জাতীয়তাবাধের সন্ধান। স্বামীজীর মানসপুত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর গৌরবোজ্জ্বল চারিত্রিক নির্মাণে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর দিগদর্শনে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা এবং রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের অন্যতম শক্তি মা সারদা দেবীর জাতীয়তাবাদে প্রেরণা।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী জ্ঞানালোকানন্দজী মহারাজ বলেন, জাতীয়তাবাদ বলতে অবশ্যই বোঝায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। ভারতবর্ষের এক অসাধারণ প্রণাম মন্ত্রে রয়েছে— ‘রত্নাকরা ধৌতপদাং, হিমালয় কিরীটিনীম্, ব্রহ্মরাজর্ষি রত্নাঢ্যাং বন্দে ভারতমাতরম্।’ তিনি বলেন, আমাদের শক্তির সাধনা করার দিন এসেছে। ভারতবর্ষের যত ধর্মমত, সবই শক্তি উপাসনার মধ্য দিয়ে এসেছে। তাই ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র হোক শক্তির উপাসনা। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ড. অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ও ‘নিবোধত’ পত্রিকার সম্পাদক সারদা মঠের প্রব্রাজিকা আপ্তকামাপ্রাণা মাতাজী। তিনি বলেন কবি মোহিতলাল মজুমদারই প্রথম জানান, ‘নেতাজী হলেন স্বামী বিবেকানন্দের মানস পুত্র’।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র-এর বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবস

বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারির বিধাননগর শাখার উদ্যোগে গত ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সল্টলেক-এর আই.ই.এস সভাকক্ষে ‘বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবস’ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। উল্লেখ্য,

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১১ সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভাতে স্বামী বিবেকানন্দ যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ডাক দিয়েছিলেন, তারই স্মরণে কেন্দ্র এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাতীয় গ্রন্থাগার ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর অধ্যাপক অজয় প্রতাপ সিং।

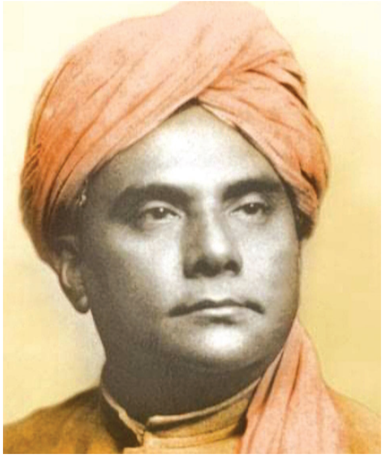

বাঙালির কাছে সেদিন যে মনীষীর চিরস্থায়ী আসন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাঙালির কাছে সেদিন যে মনীষীর চিরস্থায়ী আসন তৈরি হয়েছিল তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ। ২ অক্টোবর তাঁর জন্মদিন। অক্টোবরের দুই তারিখ নিয়ে বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীর একটি সম্ভ্রমের অন্তঃকরণ ও ইতিহাসও আছে। যেখানে বিতর্ক নেই, যেখানে রাজনৈতিক চালাকি নেই, যেখানে কথা ও কাজের মধ্যে ফারাক নেই। আছে কেবল আধ্যাত্মিক শান্তি, সৌভদ্র, ত্যাগ এবং ভালোবাসা। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর একবার বলেছিলেন, 'ভদ্রকে বিগ্রহ কহে।' তাঁরই পরম্পরা পরম শ্রদ্ধেয় মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ১৯৩৩ সালের আর এক শিকাগো ধর্মমহাসভায় বলেছিলেন, হিন্দুধর্ম ভদ্রলোকের ধর্ম। এই ধর্মপ্রচারের জন্য স্বামী অভেদানন্দ বহু বছর বিদেশে অতিবাহিত করে ভারতীয় সংস্কৃতির সুখ ও গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। আজ যে সনাতনী হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থা ও ভরসার আবহ দেখতে পাচ্ছি, তা যারা আপন সৌকর্যে বীজ বপন করে দিয়েছিলেন, তাদেরই অন্যতম স্বামী অভেদানন্দ।

স্বামী অভেদানন্দর সন্ন্যাস-পূর্ব নাম শ্রী কালীপ্রসাদ চন্দ্র। ১৮৬৬ সালের ২ অক্টোবর কলকাতার আহিরীটোলায় তাঁর জন্ম। পিতা রসিকলাল ছিলেন কলকাতার একটি নামী ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার কৃতিবিদ্য শিক্ষক।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের যোগসূত্র ছিলেন তাঁর সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য এবং পরে শশী মহারাজ বা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। প্রথম রাতেই তিনি গুরুকে আপনার মতো করে পেলেন। কালীপ্রসাদকে গুরুদেব যোগাসনে বসিয়ে জিভে ও বুকে লিখে দিলেন মূলমন্ত্র। 'তুই পূর্বজন্মে একজন খুব বড় যোগী ছিলি; সিদ্ধিলাভ করার একটু বাকি ছিল— এই তোর শেষ জন্ম, আয় তোকে যোগ সাধনের উপায় শিখিয়ে দিই।' গুরুর স্পর্শে সেদিন শিষ্যের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ঊর্ধ্বমুখে উত্থিত হল, শিষ্য ধ্যানমগ্ন হলেন, আর গুরুদেবের মধ্যে দেখলেন সকল দর্শনের সমুন্নত আদর্শ। সেদিনই কালীপ্রসাদের 'অভেদ' মন্ত্রে দীক্ষালাভ। তিনি পরে হয়ে উঠলেন স্বামী অভেদানন্দ, স্বামীজীর পর আধ্যাত্ম ভাবনায় পাশ্চাত্য দেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলবেন এবং ভারতাত্মাকে প্রকাশ করবেন দেশে-বিদেশে।

স্বামী অভেদানন্দর আত্মজীবনীমূলক লেখায় পাওয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কর্কট রোগাক্রান্ত। কাশীপুর বাগানবাড়িতে অবস্থান করছেন। পার্ষদ কালীপ্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ) ঠাকুরের সেবক হিসাবে সেখানে রয়েছেন। রয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ সহ অন্যান্য গুরুভাই ও সহধর্মিণী সারদা দেবী। ঠাকুরের গলার ব্যথা বাড়ছে, তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ঠিকমতো পদচারণা করতে পারছেন না। চিকিৎসকরা তাঁকে বলকারক পথ্য খেতে নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, কচি পাঁঠার মাংসের স্যুপ খেতে হবে। তাহলেই শরীরে শক্তি পাওয়া যাবে। কালী মহারাজের লেখনী থেকে জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকদের বলেছেন, 'দ্যাখ, তোরা যে দোকান থেকে পাঁঠার মাংস কিনে আনবি, দেখবি সেখানে কষাই কালীমূর্তি যদি না থাকে তাহলে মাংস কিনিস নি। যে দোকানে কষাই-কালীর প্রতিমা থাকবে সেই দোকান থেকে মাংস আনবি।' ভক্তরা ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। হিন্দুর দোকান থেকেই মাংস এনে শ্রীমার কাছে প্রদান করেছেন। শ্রীমা সেই মাংস অনেক সময় ধরে সিদ্ধ করে ছেঁকে কাথ্টুকু ঠাকুরকে খেতে দিয়েছেন। তখন তাঁর শক্ত জিনিস গলাধঃকরণ করার সামর্থ্য ছিল না। অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দর লেখা থেকে জানতে পারি, হিন্দুর দোকানে বিক্রি হওয়া ঝটকা মাংসই শ্রীরামকৃষ্ণদেব গ্রহণ করতেন এবং করেছেন।

স্বামী অভেদানন্দর মতো বৈদান্তিক সন্ন্যাসী খুব কমই জন্মেছেন। শ্রীমা সারদাকে নিয়ে বিখ্যাত স্তোত্রটি তিনি লিখেছিলেন, 'প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং...'। গানটি যখন গাওয়া হল, মা সারদা বললেন, 'এই ছেলেটির জিহ্বায় সরস্বতী বসবেন।' সত্যিই তাই, দেবী সরস্বতীর বরপুত্র তিনি। আমেরিকায় তিনি যে শত শত বক্তৃতা দিয়েছেন, লিখেছেন, আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অনন্য বাগ্মিতা এবং চিরন্তন জ্ঞান। পরবর্তীকালে দেশে ফিরে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে স্বামী অভেদানন্দ এক অমোচ্য নাম। তাঁর জন্মের পর দেড়শো বছর পেরিয়ে গেছে। তাঁর রচনাসম্ভারে যে অগুনতি উপাহার বিশ্ববাসীর জন্য দিয়ে গেছেন, তা যেন আমরা পড়ে দেখি এবং অনুভব করি।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩০

আগামী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের পরপর কয়েকটি দিনের কথা মনে পড়লে এখনও গা শিউরে ওঠে। উত্তর ও মধ্য কলকাতার পথঘাট ভেসে গিয়েছিল নিরীহ হিন্দুদের রক্তে। সেই সময় হিন্দুদের পরিত্রাতা রূপে যিনি পথে নেমেছিলেন, তাঁর নাম গোপাল মুখার্জি। পারিবারিক সূত্রে পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল বলে লোকে তাঁর পদবির জায়গায় 'পাঠা' বলত। সেই অদম্য সাহসী হিন্দু রক্ষাকারী মানুষটির জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন **নারায়ণ চক্রবর্তী** তাঁর লেখায়— **ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়ক**।

বর্তমান ভারতে 'হিন্দুত্ব' শব্দটি বহুচর্চিত। সেই সূত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রসঙ্গটিও। আর এই 'হিন্দুত্ব' শব্দটি গ্রন্থের শিরোনাম হিসেবে সর্বপ্রথম যিনি বিদ্বজ্জন সমাজে তুলে ধরেন সেই চন্দ্রনাথ বসুর জীবন ও সমাজ ভাবনা নিয়ে লেখা--- **'হিন্দুত্ব : চন্দ্রনাথ বসু ও আর এস এস'। লিখেছেন— বিজয় আঢ্য।**

সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই শুভ-অশুভ , দেব অসুরের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। নানান রূপে আজও প্রবহমান। মাতৃপূজার এই শুভ লগ্নে অসুরদলনী দেবী দুর্গার সেই অতুলনীয় বৈচিত্র্যময় এক রূপের কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন **প্রবাল** তাঁর লেখা— **'অথ ত্রিলিঙ্গ কথা...'** য়।

প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরকে গান্ধীহত্যার ঘটনায় যুক্ত করার চক্রান্তের দিক উন্মোচন করেছেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক **সুজিত রায়** তাঁর রচনা— **নাথুরামের বিচার ঃ এক অন্তহীন কোর্টরুম ড্রামা'য়।**

আরও যাঁরা লিখেছেন—

দেবী প্রসঙ্গ

ড. জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস

এষা দে, শেখর সেনগুপ্ত

পুরাণ কথা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গল্প

সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী, অনির্বাণ দে, দেবদাস কুণ্ডু, সমাজ বসু, জয়ন্ত পাল।

প্রবন্ধ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জোশী, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, গোপাল চক্রবর্তী , ড. পঙ্কজ কুমার রায়

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা